POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

قُلْ اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا
يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا ؕ وَاللّٰهُ
هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

তুমি বল, 'তোমরা কি আল্লাহকে ছাড়িয়া এমন কিছুর ইবাদত করিতেছ যাহা না তোমাদের অনিষ্ট করিতে পারে, না কোন উপকার, এবং আল্লাহ্‌ই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

(আল মায়েদা: ৭৭)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلّي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 10

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 24-25

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 12-19 June, 2025 15-22 জুল হজ্জ-1446 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

রসুলের বাণী

সৎ ও অসৎ সঙ্গীর উপমা

২০৯৩) হযরত আবু মূসা (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ্‌ (সা.) বলেছেন- সৎ সঙ্গী এবং অসৎ সঙ্গীর উপমা হলকস্তুরির (দোকান) এবং কামারের আগুনের ভাটা। যার উপমা কস্তুরীর সঙ্গে দেওয়া হয়েছে তার কাছ থেকে তুমি (দুটির মধ্যে একটি অবশ্যইকরবে) হয় তুমি সেটি ক্রয় করবে অথবা তার থেকে সুগন্ধি পাবে। আর কামারের জ্বলন্ত ভাটা হয় তোমার শরীর ও পরিধান পুড়িয়ে ফেলবে অথবা তার থেকে তুমি কেবল দুর্গন্ধ পাবে।

উপহার বিক্রি করা

২১০৪) হযরত সালিম বিন আব্দুল্লাহ্‌ বিন উমর (রা.) তাঁর পিতার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী (সা.) হযরত উমর (রা.) একটি রেশমের পোশাক বা রেশমের ডোরাকাটা পোশাক উপহার দিলে তিনি সেটি পরিধান করেন। আঁ হযরত (সা.)তাঁকে বলেন, আমি আপনাকে এটি পরিধান করার উদ্দেশ্যে দিই নি। এটাতো সেই ব্যক্তিই পরিধান করে যে পরকালের বরকত থেকে বঞ্চিত। আমি আপনাকে এটি একারণে পাঠিয়েছিলাম যাতে এটি থেকে আপনি উপকৃত হতে পারেন। অর্থাৎ বিক্রিকরে দেন।

হযরত দাউদ (আ.) নিজের উপার্জিত অর্থে জীবনযাপন করতেন।

১৮৮৫) হযরত মিকদাম (বিন মাআদী কারাব) (রা.)-এর পক্ষ থেকেবর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (সা.)বলেছেন, মানুষের নিজের হাতেউপার্জিত অর্থে আহার করার চাইতেউত্তম আহার নেই। আল্লাহ্‌ তা'লারনবী হযরত দাউদ (আ.) নিজের হাতেউপার্জিত অর্থেই সংসার নির্বাহ করতেন।

(বুখারী, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুল বুইয়ু)

কেবল সেই ব্যক্তিই কৃপণ নয় যে নিজের সম্পদ থেকে অভাবীদের কিছু দান করে না, বরং সেই ব্যক্তিও কৃপণ যাকে আল্লাহ্‌ জ্ঞান দান করেছেন অথচ সে অপরকে শেখাতে দ্বিধা করে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

কেবল সেই ব্যক্তিই কৃপণ নয় যে নিজের সম্পদ থেকে অভাবীদের কিছু দান করে না, বরং সেই ব্যক্তিও কৃপণ যাকে আল্লাহ্‌ জ্ঞান দান করেছেন অথচ সে অপরকে শেখাতে দ্বিধাবোধ করে। অপরকে নিজের জ্ঞান ও দক্ষতা শেখালে নিজের সম্মান হারিয়ে যাবে বা আয় উপার্জন হ্রাস পাবে- বস্তুত এমন চিন্তাধারাও শিরক করার নামান্তর। কেননা এমতাবস্থায় সেনিজের জ্ঞান ও দক্ষতাকেই রিযক তথা খোদার আসনে বসিয়ে দেয়। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি নৈতিকতা বর্জন করে সেও কৃপণ। নৈতিকতা বিসর্জন দেওয়ার অর্থ আল্লাহ্‌ নিজ কৃপাগুণে প্রত্যেককে যে নৈতিকতা দান করেছেন তা মানুষের সামনে উপস্থাপন করা। তারা এই আদর্শ দেখে নিজেরাও নিজেদের মধ্যে নৈতিকতা তৈরীর চেষ্টা করবে।

বিনম্র কণ্ঠ তথা বিনম্র ভাষা প্রয়োগ করাকেই শুধু নৈতিকতা বলে না, বরং বীরত্ব, দয়া এবং ক্ষমাপরায়ণতা-মানুষকে যেসমস্ত গুণাবলী প্রদান করা হয়েছে, বস্তুত সেগুলি সবই নৈতিক শক্তির অন্তর্ভুক্ত। এগুলির যথোচিত ও উপযুক্ত প্রয়োগই মানুষের মধ্যে নৈতিক গুণের বিকাশ ঘটায়। এমনকি সময়োচিত ক্রোধের ব্যবহারও নৈতিকতার একটি রূপ।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৯৩)

ইসলাম অন্যায়ের সময় বাহ্যিক অস্বীকারের অনুমতি দিয়েছে- খৃষ্টান লেখকদের এমন মন্তব্য এক বিরাট অন্যায় যা পাদ্রীরা এ যাবৎ ইসলামের বিরুদ্ধে করে চলেছে।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা নহল এর ১ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: প্রথমত তার সেই স্থানটি ত্যাগ করা উচিত যেখানে মানুষের চাপে ধর্ম (ধর্মাচার) ত্যাগ করতে হয়েছে। ২) দ্বিতীয়ত ধর্মের প্রচার ও প্রসারের কাজে ব্রতী হওয়া এবং ধর্ম সেবায় নিজেকে উৎসর্গিত করা। ৩) নিজেদের সংগ্রাম বন্ধ না করা,অবিচলতার সাথে তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা। আর নিজেদেরবাহ্যিক ধর্ম (ধর্মাচার) ত্যাগের পরিবর্তে অন্যদেরকে হেদায়াতদেওয়ার চেষ্টা করা। ৪) ভবিষ্যতে যেন তার থেকে এমন ভুল সংঘটিত না হয়। যদি সে এই বিষয়গুলি শিরোধার্য করে, তবে আল্লাহ্‌ এই কাজ গুলি করার পর সেই ব্যক্তিকে ক্ষমা করবেন।

ইসলাম অন্যায়ের সময় বাহ্যিক অস্বীকারের অনুমতি দিয়েছেএই ত্যাগ স্বীকারের পর তওবা গ্রহণের আদেশ থাকা সত্ত্বেও খৃষ্টান লেখকদের এমন মন্তব্য এক বিরাট অন্যায় যা পাদ্রীরা এ যাবৎ ইসলামের বিরুদ্ধে করে চলেছে। ধর্মচ্যুতি প্রসঙ্গে বর্ণিত আয়াতটি থেকে যারা এই অর্থ বের করে যে, এই আয়াতে কাপুরুষতার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে,তারা এই আয়াতগুলি প্রণিধান করে দেখুক যে কতবড় আত্মত্যাগ এই সব লোকদের কাছে চাওয়া হয়েছে।যে ব্যক্তি এই ত্যাগ-স্বীকারের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবে সে পরীক্ষার সময় কেনই বা কাপুরুষতা প্রদর্শন করবে। কেননা কাপুরুষ ব্যক্তি এত বড় ত্যাগ- স্বীকারের শক্তি রাখেই না যে সে স্বদেশ ত্যাগ করতে পারে, আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করতে পারে আর নিজেকে আজীবন এই কাজে নিয়োজিত রাখে। এই সব কাজের তৌফিক সেই ব্যক্তি পায় যে ক্ষণিকের অবহেলার কারণে ভুল করে ফেলেছে কিম্বা যে পরবর্তীতে সত্যিকার তওবা করেছে।

হযরত উমর (রা.) -এর যুগে একজন মুরতাদ তথা নবুয়তের দাবিদার পুনরায় মুসলমান হয়ে যায়। হযরত উমর (রা.) সেই ব্যক্তির প্রতি যে আচরণ করেন সেটাকে এই আয়াতের তফসীরই বলা যায়।সেই ব্যক্তির নাম ছিল তুলাইহা ইবনে খুইয়ালেদ উসদি। সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে একাধিক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। কিছুকাল পর সে ইসলামে প্রবেশ করতে চাইল, কিন্তু হযরত উমর (রা.) তাকে ক্ষমা করলেন না। একবার শারাহবিল বিন হাসানা (রা.) (যিনি শীর্ণকায় ছিলেন কিন্তু যুদ্ধ-দক্ষতায় অন্যদের চাইতে এগিয়ে ছিলেন) এক যুদ্ধে এক কাফের সর্দারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলেন। সেই সর্দার যখন দেখল যে সে তাঁকে অস্ত্রের যুদ্ধে হারাতে পারবে না, তখন সে দ্রুত এগিয়ে এসে শারাহবিল হাসানের কোমর জড়িয়ে ধরে ধরাশায়ী করে দেয় এবং তাঁর বুকের উপর চেপে বসে পড়ে। সে তাঁকে হত্যা করেই ফেলত, এমতাবস্থায় তুলাইহা বিন খুয়াইলিদ-যে কি না আন্তরিকভাবে মুসলমান হয়েছিল, কিন্তু হযরত উমর (রা.) তার তওবাগ্রহণ না করাই এখনও সে কাফেরদের সঙ্গে ছিল- সে এমন দৃশ্য নিজের ঈমানকে লুকিয়ে রাখতে পারল না আর এগিয়ে এসে সেই কাফের সর্দারের উপর তরবারি দিয়ে এমনভাবে আঘাত করল যে তার মাথা ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। আর এভাবে হযরত শারাহবিলের প্রাণ রক্ষা হল। এই ঘটনা দেখে অন্যান্য মুসলমানেরা অত্যন্ত প্রভাবিত হল আর তারা হযরত উমর (রা.)- এর নিকট তাকে ক্ষমা করে দেওয়া সুপারিশ করল। একথা শুনে হযরত উমর (রা.) বললেন, আমি তাকে একটি শর্তে ক্ষমা করছি। সে তার বাকি জীবনটুকু জিহাদের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করবে আর ইসলামি রাষ্ট্রের সীমান্তে নিজের জীবন অতিবাহিত করবে।

সুতরাং সে সব সময় সীমান্তেই থাকত আর কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করত আর এই অবস্থাতেই তার মত্যু হয়। অর্থাৎ সেই ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ধর্মত্যাগী হয়েছিল, কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে, হযরত উমর (রা.) এই আয়াতের নির্দেশ অনুসারে তাকে এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ আদেশ দিয়েছেন।

(তফসীর কবীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৫৬)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

জুমআর খুতবা

মহানবী (সা.) তাঁর আঙুল মোবারক উঁচু করেন এবং বলেন,
হে আল্লাহ! এটি তোমার তরবারিগুলোর মধ্যে একটি তরবারি, তুমি তার সাহায্য করো।
জাতিসমূহে পতাকার (প্রতি) পরম সম্মান ও শ্রদ্ধা (প্রদর্শন) করা হয়। কতক সময় শত্রুর কাছ থেকে তাদের পতাকা ছিনিয়ে নিতে অনেক বড়ো আত্মত্যাগ করা হয় আর কতক সময় নিজেদের পতাকা রক্ষার জন্য বড়ো থেকে বড়ো ত্যাগ স্বীকার করা হয়। এটা শিরক বা অংশিবাদিতা নয়।
[হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)]

মোতার যুদ্ধের প্রেক্ষাপট এবং আঁ হযরত (সা.)-এর জীবনচরিত।
সাম্প্রতিক ভারত-পাকিস্তান উত্তেজনার পরিস্থিতিতে বিশেষ দোয়ার আহ্বান।
বিশ্বের সার্বিক অবস্থার জন্য দোয়া অব্যাহত রাখুন। বিশেষ করে বর্তমানে পাকিস্তান ও ভারতের মাঝে বিরাজমান পরিস্থিতিকে সামনে রেখে দোয়া করুন।
আল্লাহ তা'লা যেন জুলুমের অবসান ঘটান। নির্যাতিতদের সুরক্ষা করেন। সরকারগুলোকে বিবেকবুদ্ধি দিন যেন যুদ্ধের দিকে অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে শান্তি পূর্ণভাবে বিষয়গুলি নিষ্পত্তি করে।
পাকিস্তানে সন্ত্রাসীদের ও জামা'তের বিরোধীদের সাহস দিন দিন বেড়েই চলেছে। আল্লাহ্ তা'লা দ্রুতই তাদের পাকড়াও করার উপকরণ সৃষ্টি করুন।
মাননীয় রফীক আহমদ সাহেব (ভালীর, জেলা কাসুর)-এর পুত্র মাননীয় মহম্মদ আসি সাহেব শহীদ এর স্মৃতিচারণ এবং জানাযা গায়েব

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ২ই মে, ২০২৫, এর জুমআর খুতবা (হিজরত, ১৪০৪ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, মুতা-র যুদ্ধের বিষয়ে আলোচনা চলছিল। এই বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ এরূপ যে, যখন মহানবী (সা.) হযরত আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহাকে বিদায় জানান, তখন হযরত আব্দুল্লাহ নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহর রসূল (সা.)! আমাকে এমন কোন কথা বলুন যা আমি আপনার নির্দেশ হিসেবে স্মরণ রাখতে পারি। তিনি বলেন, কাল তুমি এমন একটি শহরে পৌঁছবে যেখানে সিজদা কম হয়, সেখানে অধিক পরিমাণে সিজদা করবে।এটি অনেক বড়ো একটি উপদেশ। আজকের এই যুগে আমরা যেসব দেশে বাস করছি, এখানেও একই অবস্থা বিরাজমান, মানুষ আল্লাহ তা'লাকে ভুলে বসেছে। এই সময়ে, এই যুগে আহমদীদের অধিক হারে নিজেদের ইবাদতের দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত।

তারপর তিনি নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহর রসূল (সা.)! আরও কোন উপদেশ দিন। তিনি (সা.) বলেন-

আল্লাহ তা'লার জিকির বাকরতে থাকো। এটি তোমার প্রতিটি কাজে, যা তুমি চাও, তোমার সাহায্যকারী হবে। যিকরে ইলাহী বা আল্লাহ তা'লাকে স্মরণ করা অত্যন্ত জরুরি বিষয়। যাবার প্রাককালে হযরত আব্দুল্লাহ ফিরে এসেআবার নিবেদন করেন, হে আল্লাহর রসূল (সা.)! আল্লাহ বিজোড় এবং বিজোড়কে পছন্দ করেন। তখন তিনি (সা.) বলেন, প্রশ্ন করতেই থাকবে, হে ইবনে রাওয়াহা? এবার থামো। যখন তুমি অক্ষম হয়ে যাবে, এবং যদি তুমি দশজন ব্যক্তির সাথে খারাপ আচরণ করে থাকো, তবে একজনের সাথেও ভালো ব্যবহার করতে ব্যর্থ হবে না। অর্থাৎ এত খারাপ কাজের পরেও যদি আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য ভালো কাজ করো, আল্লাহর ভয় অন্তরে থাকে, তাহলে আল্লাহ তা'লা ক্ষমাশীল। অতএব আল্লাহ তা'লা সৎকর্মশীলদের ক্ষমা করেন, তাঁর রহমত বা কৃপা অত্যন্ত বিস্তৃত। সর্বদা ভালো কাজের চেষ্টায় রত থাকবে এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। এমন নয় যে, প্রতিবার দশটি খারাপ কাজ করবে এবং তারপর বলবে যে, একটি ভালো কাজ করেছি। না, বরং সত্যিকার তওবাকারী খারাপ কাজ করার পর পুনরায় খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করে এবং ভালো কাজ করে, যাতে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ লাভ করতে পারে।যাহোক, মহানবী (সা.) যখন এটি বলেন যে, তুমি একটি ভালো কাজ করতে ব্যর্থ হয়ো না, তখন হযরত আব্দুল্লাহ নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহর রসূল (সা.)! আমি এরপর আপনার কাছে কোনো প্রশ্ন করব না।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১৪৬,১৪৭)

লোকেরা তাঁর (সা.) নিযুক্ত নেতাদের বিদায় জানায়। যখন হযরত আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহাকে বিদায় জানানো হয় তখন তিনি কাঁদতে থাকেন। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করে যে, আপনাকে কোন্ বিষয়টি কাঁদাচ্ছে? তিনি বলেন, আল্লাহর কসম, আমার না দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা আছে, আর না তোমাদের প্রতি, কিন্তু আমি আল্লাহ্র রসূল (সা.)-কে এই আয়াত পড়তে শুনেছি, যেখানে আগুনের উল্লেখ আছে অর্থাৎ وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا (সূরা মরিয়ম: ৭২)। অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে অবশ্যই সেখানে অবতরণ করবে না। এটা করা তোমার প্রভুর জন্য একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের আকারে আবশ্যক। তিনি বলেন, আমি জানি না যে, অবতরণ করার পর আমার প্রত্যাবর্তন কেমন হবে। অর্থাৎ, এমন অবস্থা যদি হয় তাহলে। এতে মুসলমানরা বলেন, আল্লাহ তোমার সাথে থাকুন এবং তিনি তোমাদের থেকে তা অর্থাৎ মন্দ বিষয়াদি দূর করুন, এবং তোমরা আমাদের কাছে পুণ্যবান হিসেবে ফিরে এসো।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১৪৫)

অর্থাৎ বিদায় দিতে আসা ব্যক্তিরা সবাইকে দোয়া দেন। তাদের মধ্যে এই ছিল ভয়, অন্যথায় মুমিনের জন্য আল্লাহ তা'লা বলেছেন যে, সে জাহান্নামে যাবে না। এখানে যা বলা হয়েছে তার অর্থ হলো, মুমিনরা জাহান্নামের অংশ এই দুনিয়াতে কাফেরদের দেয়া কষ্টের কারণেও পেয়ে যায়, এবং মৃত্যুর পরের জাহান্নাম তাদের থেকে অনেক দূরে থাকে। সাহাবীরা এই বিষয়টি বুঝেই বলেছিলেন যে, আল্লাহ তা'লা এই পার্থিব কষ্টও তোমাদের থেকে দূর করুন এবং তোমরা আমাদের কাছে সঠিক অবস্থায় ফিরে এসো, আল্লাহর অনুগ্রহ তোমাদের সাথী হোক।

বর্ণিত আছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা জুমুআর নামাজের পর মদীনা থেকে গিয়েছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহর রসূল (সা.) একটি অভিযানে সাহাবীদের মুতা অভিমুখে প্রেরণ করেন, যাতে হযরত আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহাও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। জুমুআর দিন ছিল। অভিযানে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য সাহাবীরা রওয়ানা হয়ে যান। আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা বলেন যে, আমি কিছুটা বিলম্বে বের হবো। মহানবী

(সা.)-এর সাথে জুমুআর নামাজ আদায় করে আমি তাদের সাথে গিয়ে মিলিত হব। এরপর যখন তিনি রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে নামাজ পড়ছিলেন, তখন তিনি (সা.) তাকে দেখে বলেন, তোমাকে কিসে তোমার সাথীদের সাথে রওয়ানা হতে বাধা দিয়েছে? তিনি নিবেদন করেন যে, আমার ইচ্ছা ছিল আমি আপনার সাথে জুমুআর নামাজ আদায় করব, তারপর তাদের সাথে যোগ দেবো। মহানবী (সা.) বলেন, পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার সবকিছুও যদি তুমি খরচ করে দাও, তবুও যারা অভিযানে রওয়ানা হয়ে গেছে, তাদের (ন্যায়) কল্যাণ তুমি লাভ করতে সক্ষম হবে না।

(সুনান তিরমিযি, আবওয়াবুল জুমআ, হাদীস-৫২৭)

অর্থাৎ, আমি যখন (লোকদের) অভিযানে পাঠিয়ে দিয়েছি, তোমার কর্তব্য ছিল তুমি এটা না বলা যে, আমি জুমুআ পড়ে নিই, বরং অবিলম্বে রওনা হওয়া উচিত ছিল।

হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদের প্রথমবার মুসলমানদের পক্ষে যুদ্ধ করার উল্লেখ পাওয়া যায়। হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ একজন বিখ্যাত অশ্বারোহী ছিলেন। তিনিও এই সেনাবাহিনীর একজন সাধারণ সৈনিক ছিলেন। মহানবী (সা.) এর এই সেনাবাহিনী সমবেত করার সময় হযরত খালেদ-এর ইসলাম গ্রহণ করার মাত্র তিন মাস অতিবাহিত হয়েছিল।

(গাযওয়ায়ে মুতা, পৃ: ২৭৩)

যখন মুসলমানরা মদীনা থেকে কিছু দূরে পৌঁছে, তখন শত্রুরা তাদের সংবাদ জেনে যায় আর তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া আরম্ভ করে। সম্ভবত মদীনার মুনাফেক এবং ইহুদিরা মুসলমানদের একত্রিত হওয়া এবং তাদের সিরিয়ার দিকে অগ্রসর হওয়ার খবর ছড়িয়ে দিয়েছিল, যেন মুসলামানদের প্রতিদ্বন্দ্বীতার যারা ছিল, অর্থাৎ খ্রিষ্টানরা, আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে।

শারাহবিল বিন আমর আরব উপদ্বীপের সাথে লাগোয়া সিরিয়ার দক্ষিণ অঞ্চলে রোমানদের গভর্নর ছিল। সে মদীনার রোমান গুপ্তচরদের কাছ থেকে এই সেনাবাহিনীর অগ্রসর হওয়ার সংবাদ পায়। সে রোমানদের অবগত করতে লোক পাঠায় যে, মুসলমানরা সিরিয়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তারপর সে রোমানদের মিত্র গোত্রগুলোর মধ্য থেকে সিরিয়ার দক্ষিণে সেনাসমাবেস ঘটাতে থাকে। তারপর সে নিজেই সেই মুহূর্তে তার ভাইকে তার কিছু লোকের সাথে অগ্রবাহিনী হিসাবে পাঠায় যাতে তারা তার জন্য ইসলামী বাহিনীর খবরাখবর সংগ্রহ করতে পারে।

(গাযওয়ায়ে মুতা, পৃ: ২৭৭-২৭৮)

এটাও লেখা আছে যে, অন্যদিকে শারাহবিল বিন আমর এক লাখেরও বেশি সৈন্যের একটি বাহিনী প্রস্তুত করে। মুসলমানরা যখন কুরা উপত্যকায়পৌঁছে, তখন শারাহবিল তার ভাই সদূসকে পঞ্চাশ জন মুশরিকের সাথে পাঠায়। তারা মুসলমানে দের সাথে যুদ্ধ করে। সদূসের সাথীরা পরাজিত হয় এবং সে নিজেও নিহত হয়। মুসলমানরা অগ্রযাত্রা অব্যহত রাখে আর সিরিয়ার মাআন এলাকায় পৌঁছে। এই জায়গাটি মুতা -র পূর্বে অবস্থিত। এখানে সাহাবীরা শত্রুদের সংখ্যাধিক্য এবং তাদের একত্রিত হওয়ার বিষয়ে জানতে পারেন এবং তারা খবর পান যে, হিরাক্লিয়াস এক লক্ষ রোমান সৈন্যের সাথে বালকা-র মাআব অঞ্চলে এসেছে এবং তার সাথে বিভিন্ন গোত্র থেকে এক লাখ আরবও যোগ দিয়েছে।

আল্লামা যুরকানি বলেন যে, সম্ভবত এই এক লক্ষ সৈন্যের বাহিনী সেটিই যা শারাহবিল একত্রিত করেছিল। মুসলমানরা দুই রাত মাআন-এ অবস্থান করে এবং তারা এই বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে থাকে। কেউ কেউ বলেন যে, আমরা রসূলুল্লাহ (সা.)-কে চিঠি লিখে সব খবর দিয়ে দিই। তিনি অতিরিক্ত সৈন্য পাঠিয়ে আমাদের সাহায্য করবেন বা অন্য কোনো আদেশ দেবেন যা আমরা পালন করব। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.) তাদেরকে সামনে অগ্রসর হবার জন্য সাহস যোগান এবং বলেন, হে আমার জাতি! আল্লাহ্‌র কসম! যে বিষয়কে (এখন) তোমরা অপছন্দ করছ তা অর্জন করার জন্যই তো তোমরা বের হয়েছিলে। তোমরা শাহাদতের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বের হয়েছ। আমরা মানুষের সাথে সংখ্যা কিংবা শক্তির ভিত্তিতে জিহাদ করি না। তিনি বলেন, আমাদের জিহাদ সংখ্যার বিচারে কিংবা শক্তির বিচারে হয় না বরং (আমরা) সেই সত্য ধর্মের কল্যাণে তাদের সাথে জিহাদ করি, যদ্বারা আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সম্মানিত করেছেন। সামনে অগ্রসর হও, তোমরা দু'টি কল্যাণের মধ্যে থেকে একটি লাভ করবে। বিজয় কিংবা শাহাদত। এই দু'টি মর্যাদা মন্দ নয়। সাহাবীরা বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! ইবনে রওয়াহা সত্য বলেছে। (এরপর) সাহাবীরা সামনে অগ্রসর হন। যখন তখুমুল বালকায়পৌঁছান তখন তারা হিরাক্লিয়াসের সৈন্য বাহিনীর সম্মুখীন হন, যা রোম ও আরববাসীর সমন্বয়ে গঠিত ছিল। এটি বালকার জনপ দগুলোর একটি জনপদ ছিল, যার নাম ছিল মাশারিফ। শত্রুরা নিকটে এলে মুসলমানরা সেই বসতির দিকে চলে যান, যার নাম ছিল মূতা। সেখানেই সত্য-মিথ্যার মধ্যকার যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। মুসলমানরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি গ্রহণ করে। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) এই যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন, যখন শত্রুরা আমাদের কাছে আসে আর আমর া এত বিশাল সৈন্যরাজি, এরূপ উত্তম রণপ্রস্তুতি, অস্ত্রশস্ত্র, ঘোড়া, রেশম ও স্বর্ণ আগে (কখনো) দেখি নি। এমনকি আমার চোখ বিস্ফারিত হয়ে যায়। হযরত সাবেত বিন আকরাম (রা.) আমাকে জিজ্ঞেস করেন, আবু হুরায়রা! তুমি বিশাল সৈন্যবহর দেখছ? আমি উত্তরে বলি, জ্বি। তিনি বলেন, তুমি আমাদের সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করোনি। আমরা সংখ্যার আধিক্যের কারণে বিজয়ী হই নি।

ইবনে ইসহাক লেখেন, মুসলমানরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং সৈন্যবহরের ডানে ও বামে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়।

হযরত যায়েদ (রা.) -র শাহাদতের বিষয়ে লেখা আছে, এরপর যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যায় এবং তুমুল লড়াই হয়। হযরত যায়েদ বিন হারেসা মহানবী (সা.)-এর পতাকা নিয়ে যুদ্ধ করেন, অবশেষে শত্রুর বর্শার আঘাতে শাহাদতের অমিয় সুধা পান করেন। এরপর হযরত জাফর (রা.) ইসলামের পতাকা হাতে তুলে নেন এবং যুদ্ধ করেন। যখন যুদ্ধ করতে তার অসুবিধা হচ্ছিল তখন তিনি তার ঘোড়া 'শাকরা' থেকে নিচে নেমে যান। সেটির পায়ের রগ কেটে দেন এরপর লড়তে লড়তে তিনিও শহীদ হয়ে যান।

হযরত জাফর (রা.) প্রথম মুসলমান ছিলেন যিনি আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিজের ঘোড়ার রগ কেটে দিয়েছিলেন।

বনু মুর্‌রা বিন অওফ গোত্রের এক ব্যক্তি মূতার যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি বলেন, আমি যেন এখনো হযরত জাফর (রা.)-কে দেখছি যখন তিনি তার শুকরা ঘোড়া থেকে নিচে নামেন আর এর রগ কেটে দেন এরপর যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে যান। তখন তিনি এই পংক্তি পাঠ করছিলেন,

يَا حَبَّذَا الْجَنَّةُ وَاقْتِرَابُهَا طَيِّبَةً وَبَارِدًا شَرَابُهَا
وَالرُّوْمُ رُوْمٌ قَدْ دَنَا عَذَابُهَا كَافِرَةٌ بَعِيْدَةٌ أَنْسَابُهَا
عَلَيَّ إِذْ لَاقَيْتُهَا ضِرَابُهَا

অর্থাৎ, 'জান্নাত আর এর নৈকট্যের কথা আর বলো না! এর সুধা কতই-না পবিত্র ও সুশীতল। রোমানরা বরাবরই রোমান। তাদের শাস্তি ঘনিয়ে এসেছে। তারা কাফির, তাদের বংশে হদিশ পাওয়া কঠিন। আমি যখন যুদ্ধ করব তখন তাদের আঘাত করা আমার জন্য অপরিহার্য।' এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, হযরত আবু আমের (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত জাফর (রা.) অস্ত্রে সজ্জিত হন এবং মুশরিকদের ওপর আক্রমণ করেন। যখন তার আশঙ্কা হয় যে, শত্রুরা তাকে ঘিরে ফেলবে তখন তিনি অস্ত্র ফেলে দেন। তিনি শত্রুদের ওপর আক্রমণ করেন এবং বর্শা দিয়ে আঘাত করেন এবং পরিশেষে শহীদ হয়ে যান।

ইবনে হিশাম বর্ণনা করেছেন, হযরত জাফর বিন আবু তালিব (রা.) নিজের ডান হাতে পতাকা ধারণ করেন। সেই হাত কর্তিত হলে বাম হাতে পতাকা ধারণ করেন। সেটিও কাটা পড়ে, এরপর তিনি কনুই দিয়ে পতাকাটি বুকের সাথে জড়িয়ে ধরেন এবং শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়ে যান। তখন তার বয়স ছিল তেত্রিশ বছর। আল্লাহ্ তা'লা এই বাহুদ্বয়ের বিনিময়ে তাকে দু টি ডানা দান করেছিলেন, তার সাহায্যে তিনি জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা উড়ে বেড়াতেন। এটাও বলা হয়, এক রোমান (সৈন্য) তার ওপর আঘাত করে তাকে দু'টুকরো করে ফেলেছিল।

ইমাম বুখারী ও ইমাম বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ্ বিন উমর (রা.)-র বরাতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, 'আমি এই যুদ্ধে যোগদান করেছিলাম। আমরা হযরত জাফর (রা.) -র সন্ধান করতে থাকি (এবং) তাকে শহীদদের মধ্যে (খুঁজে) পাই। আমরা দেখি যে, তার শরীরে ষাটটির অধিক বর্শা ও তিরের আঘাতের চিহ্ন ছিল।' অপর রেওয়ায়েতে রয়েছে, 'আমি তার শরীরে বর্শা ও তরবারির পঞ্চাশটি আঘাত গণনা করেছি। এর মধ্যে একটি আঘাতও তার পিঠে ছিল না, সবগুলো (আঘাত) সামনের দিকে ছিল।' হযরত জাফর (রা.) শহীদ হওয়ার পর ইসলামের পতাকা হযরত আবদুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.) গ্রহণ করেছিলেন। লেখা আছে, তিনি তার ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে যান। পূর্বেও বর্ণনা করা হয়েছে, হযরত জাফর (রা.)-র ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে। {হযরত আবদুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.), হযরত জাফর (রা.)-র পরে সেনাপতি নিযুক্ত হন। তার মনে দ্বিধা জাগে, কিছুটা সন্দেহ জাগে, ভীতি সঞ্চারিত হয়।} তখন তিনি এই (কবিতার) পঙক্তি আবৃত্তি করেন, যার

যুগ ইমামের বাণী

শাহাদতের প্রাথমিক ধাপ হল খোদার পথে অবিচল ও অটল থাকা। (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪২৩)

দোয়াপ্রার্থী: Late Younus Gazi
From-Raju Gazi Sb. Ghutiari Shareef, 24 PGS (s)

অর্থ হলো,'হে আমার প্রাণ! আমি শপথ করেছি, তুমি অবশ্যই রণক্ষেত্রে নামবে। হয় সানন্দে যাবে অথবা তোমাকে বাধ্য করা হবে। যদি লোকেরা একত্রিত হয়ে তিরধনুক তাক করে নেয়, তবুও আমি কেন দেখছি যে, তুমি জান্নাতকে পছন্দ করছ না?' (তোমার অনেক সন্দেহ রয়েছে।) এরপর কবিতার সুরে তিনি বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে তুমি এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিলে। তুমি একটি পুরোনো মশক থেকে ঝরে পড়া এক বিন্দু (পানি) মাত্র।' যাহোক, এই আবৃত্তির পর তিনি নিজের ঘোড়া থেকে নিচে নামেন। হযরত ইবনে উমর (রা.) একটি হাড়যুক্ত মাংস নিয়ে আসেন আর বলেন, 'এটা দিয়ে নিজের কোমর শক্ত করে নিন।' (মাংস খেলে কিছুটা শক্তি পাবেন। ভুনা মাংস ছিল।) এ -দিনগুলোতে তাকে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। তিনি সেই হাড়যুক্ত মাংস নেন এবং তার থেকে কিছু অংশ ছিঁড়েন। এরইমধ্যে একদিকে লোকদের মধ্যে অস্ত্রের শব্দ শুনতে পান। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার এবং তরবারির সংঘর্ষের শব্দ শুনতে পান। তখন তিনি নিজের মনকে বলেন, 'তুই এখনো দুনিয়া নিয়ে পড়ে আছিস? (এরপর) সেই হাড়টি নিজের হাত থেকে ফেলে দেন। (লোকেরা তরবারি নিয়ে লড়াই করছে আর (তুই) মাংস খাওয়া নিয়ে ব্যস্ত ?) তিনি তৎক্ষণাৎ সেটি ফেলে দিয়ে নিজের তরবারি হাতে তুলে নেন, সামনে এগিয়ে যান এবং লড়াই শুরু করেন, এমনকি তিনি শহীদ হয়ে যান এবং তার হাত থেকে পতাকা পড়ে যায়। মুসলমান ও মুশরিকরা (রণক্ষেত্রে) পরস্পরের ওপর হামলা করে বসে। কিছু লোক পিছু হটে যায়। তখন উতবা ইবনে আমের (রা.) চিৎকার করে বলতে থাকেন, 'হে (আমার) স্বজাতি! পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা থেকে চেয়ে সামনে এগিয়ে যুদ্ধ করা অধিক উত্তম।' (তিনি লোকদের অনুপ্রাণিত করেন।) এক রেওয়ায়েত মোতাবেক, হযরত যায়েদ, জাফর এবং আবদুল্লাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহুমকে একই কবরে সমাহিত করা হয়েছিল।

হযরত আবু আমের (রা.) বর্ণনা করেন, যখন হযরত আবদুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.) শহীদ হন, তখন মুসলমানদের চরম পরাজয়ের মুখোমুখী হওয়ার আশংকা দেখা দেয়। তিনি বলেন, 'আমি দু'জন লোককেও একসাথে দেখি নি।' তারা সম্পূর্ণরূপে ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। একজন আনসারী ব্যক্তি পতাকা তুলে নেন। তিনি দৌঁড়ে এসে লোকদের সামনে পতাকা গেঁড়ে দেন। তারপর বলেন, 'হে লোকেরা, আমার নিকটে আসো।' লোকেরা তার কাছে সমবেত হয়। (পতাকা আসার পর মুসলমানরা আবার একত্রিত হতে শুরু করেন।) যখন তাদের সংখ্যা বেড়ে যায়, তখন তারা হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.)-র কাছে যান। হযরত খালিদ (রা.) সেই আনসারীকে বলেন, 'আমি এটা (পতাকা) আপনার কাছ থেকে নিব না। আপনি এই পতাকার বেশি যোগ্য।' সেই আনসারী বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তাকে আপনার জন্য হাতে তুলে নিয়েছি। আমি আপনাকে দেওয়ার জন্যই এটি হাতে নিয়েছি । যাহোক, হযরত খালিদ (রা.)-এর নেতৃত্ব , কাফিরদের পরাজয় এবং আল্লাহ তা'লা কর্তৃক মহানবী (সা.)-কে বিজয়ের সংবাদ দেওয়ার বিস্তারিত বিবরণও হলো,

হযরত আবু ইউসার আনসারী (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা.) যখন শহীদ হন, তখন আমি ইসলামের পতাকা হযরত সাবিত বিন আকরাম (রা.)-কে দিই। হযরত সাবিত (রা.) হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-কে বলেন: "আপনি রণকৌশলের বিষয়ে আমার চেয়ে বেশি অভিজ্ঞ।" অতঃপর সেই পতাকাটি হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-কে হস্ত ান্ত র করা হয়। ইবনে ইসহাক বলেন, হযরত খালিদ (রা.) পতাকা গ্র হণ করে মুসলমানদের প্রাণ রক্ষা করেন, তাদের একত্র করেন এবং নিজের বাহিনীকে এক পাশে সরিয়ে নিয়ে যান। শত্রুরাও তাদের থেকে কিছুটা পেছনে সরে যায় এবং হযরত খালিদ (রা.) মুসলমানদের প্রাণ বাচিয়ে তাদেরকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনেন। ইবনে ইসহাকের মতে, এই পশ্চাদপসরণ ছিল রোমানদের কবল থেকে আত্মরক্ষার একটিকৌশল। কারণ তখন দুই হাজারেরও বেশি মুসলমান রোমান বাহিনীর মাঝে আটকা পড়েছিলেন, অর্থাৎ তারা একে অন্যের ওপর হামলায় রত ছিল। মুসলিম বাহিনীর মোট সংখ্যা ছিল কেবল তিন হাজার। এই দৃষ্টিকোণ থেকে এই অভিযানকে বিজয় হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, কারণ শত্রুরা মুসলমানদের ঘিরে ফেলেছিল, তারা তাদের বিরুদ্ধে সমবেত ছিল। প্রায় সকলেই শহীদ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এমনই আশঙ্কা করা হচ্ছিল তবে এটি বলা মহানবীর উক্তি "এক পর্যায়ে আল্লাহ তা'লা তোমাদের বিজয় দান করবেন।" এর পরিপন্থি ছিল ।এর তাৎপর্য ছিল, তোমরা প্রাণে রক্ষা পাবে। বিজয়ের বিভিন্ন দিক থেকে থাকে।বেশিরভাগ জীবনীকাররা লিখেছেন, হযরত খালিদ (রা.) ও তাঁর সঙ্গীরা শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেতাদের পরাস্ত করেন।

হযরত আবু আমির বলেন, হযরত খালিদ (রা.) যখন পতাকা হাতে নেওয়ার পর শত্রুর উপর আক্রমণ করেন এবং আল্লাহ তা'লা শত্রুকে কঠিনভাবে পরাজিত করেন। এমন পরাজয়আমি আগে কখনও দেখি নি। মুসলমানরা শত্রুদের যেভাবে চেয়েছে সেভাবে হত্যা করেছে; এমনও রেওয়ায়েত আছে।

হযরত খালিদের রণকৌশলের বিষয়ে অপর একটি রেওয়ায়েত হলো, হযরত খালিদ (রা.) মুতার যুদ্ধে বাহিনীকে পুনর্বিন্যস্ত করেন, অশ্বারোহীদের সমন্বয়ে একটি দল নির্বাচন করেন এবং গোপনে তাদেরকে রাতের আঁধারে দক্ষিণে, আরব উপদ্বীপের দিকে মুসলিম বাহিনীর পিছনে এমন একটি স্থানে শিবির স্থাপনের নির্দেশ দেন যা হবে রোমানদের দৃষ্টির অগোচরে।হযরত খালিদ (রা.) তাদের আদেশ দেন, তারা যেন আলাদা আলাদা দলে বিভক্ত হয়ে মুসলিম বাহিনীর পশ্চাৎ থেকে মুতার দিকে এগিয়ে আসে এবং উচ্চৈঃস্বরে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি উচ্চকিত করে। সেইসাথে ধুলা উড়ানোর উদ্দেশ্যে নিজেদের ঘোড়াগুলোকে যেন এমন ধুলোময় স্থানে ধ্বাবিত করে। হযরত খালিদ (রা.)-এর পক্ষ থেকে এই নির্দেশনাগুলো দানের উদ্দেশ্য ছিল- শত্রু যেন মনে করে মুসলমানদের সাহায্যে অতিরিক্ত সৈন্য এসে গেছে।হযরত ইবনে উমর (রা.) বলেন, হযরত খালিদ (রা.) বাহিনীকে পুনবিন্যস্ত করতে গিয়ে সেনাবাহিনীর সম্মুখভাগকে পশ্চাতে আর পশ্চাতের বাহিনীকে সামনে, ডান দিককে বামে এবং বাম দিককে ডানে স্থানান্তরিত করেন। শত্রুরা তা দেখে হতবাক হয়ে যায়। তারা ভাবল, সম্ভবত মুসলিমদের নতুন সহায়ক বাহিনী এসে গেছে অতিরিক্ত সৈন্য এসে গিয়েছে। ফলে তারা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং পরাজিত হয়।

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা.) হযরত যায়েদ (রা.), হযরত জাফর (রা.) এবং হযরত ইবনে রাওয়াহা (রা.)-এর শহীদ হওয়ার সংবাদ লোকদের কাছে কোন সংবাদ আসার পূর্বেই তাদের অবহিত করেন। তিনি বলেন, "জায়েদ (রা.) পতাকা হাতে নেন, তিনি শহীদ হন। তারপর জাফর (রা.) নেন, তিনিও শহীদ হন। অতঃপর ইবনে রাওয়াহা পতাকা ধারণ করেন, তিনিও শহীদ হয়ে যান। (একথা বলার সময়) মহানবী (সা.)-এর চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল। তিনি(সা.) বলেন, এক পর্যায়ে পতাকা আল্লাহ্‌র তরবারিগুলোর একটি নিজ হাতে নেয় আর অবশেষে আল্লাহ্ তাদেরকে বিজয় দান করেন। এটি বুখারীর বর্ণনা। হযরত আবু কাতাদা (রা.) বর্ণনা করেন, এরপর মহানবী (সা.) তাঁর আঙুল মোবারক উঁচু করেন এবং বলেন,

হে আল্লাহ! এটি তোমার তরবারিগুলোর মধ্যে একটি তরবারি, তুমি তার সাহায্য করো।

সেই দিন থেকেই হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.) -কে সাইফুল্লাহ্ অর্থাৎ' আল্লাহ্‌র তরবারি হিসেবে ডাকা হয়।

একটি বর্ণনা অনুযায়ী এই যুদ্ধ সাতদিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১৪৭-১৫১) (ফারহাঙ্গে সীরাত, প্রণেতা -ফজলুর রহমান, পৃ: ২৭৯) (সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৪২৬২,৪২৬০) (শারা যুরকানী, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৪৩) (গযওয়ায়ে মুতা, পৃ: ৩৪৩)

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) ও এ বিষয়ে বর্ণনা করে বলেন, এটি ছিল প্রথম সেনাদল যেটি ইসলামের পক্ষে খ্রিষ্টানদের মোকাবেলার জন্য বের হয়েছিল। যখন সেনাদলটি সিরিয়া সীমান্তে পৌঁছায় তখন তারা জানতে পারে যে, কায়সার (তথা রোমান সম্রাট) এদিকে এসেছে আর এক লক্ষ রোমান সৈন্য তার সঙ্গে রয়েছে। এছাড়া আরব গোত্রের এক লক্ষ খ্রিষ্টান সৈন্যও তাঁর সঙ্গে রয়েছে। তখন মুসলমানরা পথিমধ্যেই শিবির স্থাপন করে মহানবী (সা.)-কে খবর পাঠানোর কথা ভাবে যাতে তিনি সেনা সাহায্য পাঠাতে চাইলে পাঠাতে পারেন বা কোনো নির্দেশনা জানাতে পারেন।এই পরামর্শ যখন চলছিল তখন আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে যান এবং বলেন, হে আমার স্বজাতি! তোমরা তো খোদার পথে শহীদ হওয়ার জন্য ঘর থেকে বের হয়েছিলে। আর যে উদ্দেশ্যে তোমরা

যুগ খলীফার বাণী

কঠিন পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের একটিই পথ- আল্লাহ্ তা'লার সমীপে নতজানু হও। (খুতবা, জুমআ, ১০ই মার্চ, ২০১৭)

দোয়াপ্রার্থী: **Late Shohrae Alam & Alia Bibi**
From-Mahmood Alam Sb. Barisha, 24 PGS (s)

যুগ ইমামের বাণী

জ্ঞান বলতে যুক্তি কিম্বা দর্শনশাস্ত্রকে বোঝানো হয় না, বরং প্রকৃত জ্ঞান সেটাই যা আল্লাহ তা'লা (মানুষকে) কেবল নিজ কৃপাগুণে দান করেন।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৯৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Late Haji Ansar**
From-Rezuwan Islam Mandal. Bithari, 24 PGS (N)

বের হয়েছিলে সে বিষয়কেই ভয় করছ। এরপর তিনি (রা.) বলেন, আমরা লোকদের সাথে নিজেদের সংখ্যা, শক্তি কিংবা সংখ্যাধিক্যের বলে যুদ্ধ করি নি। আমরা তো সেই ধর্মের সাহায্যের জন্য শত্রুদের সাথে লড়াই করছি, যা খোদা তা'লা নিজ অনুগ্রহে আমাদের দান করেছেন। শত্রুদের সংখ্যা যদি বেশি হয়, তো হোক। পরিশেষে দুটি কল্যাণের মধ্যে একটি আমরা অবশ্যই লাভ করবো। হয় আমরা জয় লাভ করবো নতুবা খোদার পথে আমরা শাহাদাতবরণ করবো।লোকেরা তাঁর (রা.) কথা শুনে বলতে আরম্ভ করে, ইবনে রাওয়াহা একদম সত্য বলছেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে তাদের যাত্রা করার নির্দেশ দেন। তারা যখন অগ্রসর হন তখন রোমান বাহিনী তাদেরকে তাদের দিকে অগ্রসর হতে দেখতে পেল। মুসলমান সৈন্য মুতা নামক স্থানে নিজেদের বাহিনীকে সারিবদ্ধ করে নিল এবং যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। স্বল্প সময়েই মুসলমানদের প্রধান সেনাপতি হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.) শাহাদাতবরণ করেন। তখন ইসলামি সেনাদলের পতাকা গ্রহণ করলেন মহানবী (সা.)-এর চাচাতো ভাই হযরত জাফর বিন আবি তালিব এবং সেনাদলের দ্বায়িত্ব তিনি শামলে নেন। তিনি যখন দেখতে পান, শত্রুবাহিনী ঢেউয়ের আকারে এগিয়ে আসছে আর মুসলমানরা নিজেদের সংখ্যার স্বল্পতার কারণে তাদের (শত্রু পক্ষের) চাপ সহ্য করতে পারবে না, তখন তিনি উত্তেজনার বসে নিজ ঘোড়া থেকে নিচে নামেন এবং ঘোড়ার পা কেটে দেন। এর অর্থ এটিই ছিল যে, কমপক্ষে আমি এই রণক্ষেত্র থেকে পিছু হটছি না। আমি মৃত্যুকে বরণ করে নিবো কিন্তু পলায়ন করাকে পছন্দ করবো না। এটি আরবের একটি রীতি ছিল। তারা ঘোড়ার পা এজন্য কেটে দিত যাতে করে সে বাহন বিহীন অবস্থায় দ্বিগবিদিক ছুটাছুটি করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে না পারে। এজন্য তারা কেবল নামতোই না বরং ঘোড়ার পা কেটে দিতো। অল্প সময়ের যুদ্ধে তঁ ার ডান হাত কেটে ফেলা হয়। এরপর তিনি বাম হাতে পতাকা তুলে নেন। অতঃপর তার বাম হাতও কেটে ফেলা হয়। তারপর তিনি উভয় কর্তিত বাহু দিয়ে পতাকা নিজের বক্ষে টেনে নেন এবং রণক্ষেত্রে অবিচল থাকেন এমনকি তিনিওশাহাদাতের পেয়ালা পান করেন। অতঃপর আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী পতাকা নিজ হাতে তুলে নেন আর তিনিও লড়াই করতে করতে শাহাদাত বরণ করেন। সেই মুহূর্তে মুসলমানদের জন্য এমন কোনো সু যোগ ছিল না যে, আলোচনা করে কাউকে সর্দার নিযুক্ত করবে এবং শত্রু বাহিনীর সংখ্যাধিক্যের কারণে মুসলমানরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পিছপা হওয়ার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছায়। তখন হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ তাঁর এক বন্ধুর পরামর্শে পতাকা হাতে তুলে নেন এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত শত্রুর মোকাবেলা করেন।

পরের দিন পুনরায় খালেদ (রা.) নিজের ক্লান্ত -শ্রান্ত এবং আহত সৈন্যদল নিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য বের হন। তিনি রণকৌশের অংশ হিসেবে, সৈন্যদলের সামনের অংশকে পিছনে আর পিছনের অংশকে সামনে এবং ডানের (অংশকে) বামে আর বামের (অংশকে) ডানে নিয়ে আসেন। আর এমনভাবে ধ্বনি উচ্চকিত করেন যে, শত্রুরা মনে করে মুসলমানদের বর্ধিত সেনা সাহায্য লাভ হয়েছে। এতে শত্রু পিছু হটে যায় আর হযরত খালেদ (রা.) ইসলামী সেনাদলকে সুরক্ষিত করে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। শত্রুরা নিজেই পিছু হটে যায়। মুসলমানরা (তাদের) পিছু হটিয়ে দেয় নি। এটিও নয় যে, (মুসলমানরা) তাদেরকে ভয় পেয়েছে বরং শত্রুরা নিজেই পিছু হটে গিয়েছিল।

"মহানবী (সা.)-কে আল্লাহ্ তা'লা এই ঘটনার সংবাদ সে দিনই ওহীর মাধ্যমে দিয়ে দেন। তিনি (সা.) সকল মুসলমানকে মসজিদে সমবেত হওয়ার জন্য ঘোষণা করান। তিনি (সা.) যখন মিম্বরে আরোহন করেন তখন তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছিল। তিনি (সা.) বলেন, হে লোক সকল! আমি তোমাদেরকে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সেনাদল সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছি। সেই সেনাদল এখান থেকে গিয়ে শত্রুর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দণ্ডায়মান হয়। যুদ্ধ আরম্ভ হলে প্রথমে যায়েদ নিহত হয়। অতএব, তোমরা যায়েদের জন্য দোয়া কর। এরপর পতাকা জা'ফর নেয় আর শত্রুর ওপর আক্রমণ করে, এমনকি সেও শহীদ হয়ে যায়। অতএব, তোমরা তার জন্যও দোয়া কর। এরপর পতাকা আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা নেয় আর অত্যন্ত বীরত্বের সাথে সৈন্যদলকে পরিচালিত করেছে, কিন্তু পরিশেষে সেও শহীদ হয়ে যায়। অতএব তোমরা তার জন্যও দোয়া কর। এরপর পতাকা খালেদ বিন ওয়ালিদ নেয়। তাকে আমি সেনাপতি নিযুক্ত করি নি। তবে সে স্বয়ং নিজেকে সেনাপতি নিযুক্ত করে কিন্তু সে খোদা তা'লার তরবারিগুলোর মধ্যে একটি তরবারি।"

এর বিস্তারিত হলো এক বন্ধুর অনুরোধে এটি হয়েছিল। "অতএব, সে খোদা তা'লার সাহায্যে ইসলামী সেনাদলকে নিরাপদে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। তাঁর (সা.)-এর এই বক্তৃতার কারণে খালেদ (রা.) -এর নাম মুসলমানদের মাঝে 'সাইফুল্লাহ্' অর্থাৎ খোদার তরবারি প্রসিদ্ধি লাভ করে। যেহেতু খালেদ (রা.) শেষে ঈমান আনয়ন করেছিলেন তাই কতক সাহাবী তাকে রসিকতা করে বা কোনো বিবাদ -বিতণ্ডার সময় বিদ্রুপ করত। একবার এমনি এক বিষয় নিয়ে হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)-এর সাথে তার বিতর্ক হয়। তিনি (রা.) মহানবী (সা.) কাছে খালেদ (রা.)-এর ব্যাপারে অভিযোগ করেন। মহানবী (সা.) বলেন, খালেদ! তুমি এই ব্যক্তিকে কেন কষ্ট দাও যে কিনা বদরের যুগ থেকে ইসলামের সেবা করছে? তুমি যদি উহুদ সমানও স্বর্ণ ব্যয় কর তবুও তার সমান খোদা তা'লার কাছে থেকে পুরস্কার লাভ করতে পারবে না। এতে খালেদ (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! তারা আমাকে বিদ্রুপ করে তাই আমিও জবাব দিই। মহানবী (সা.) বলেন, তোমরা খালেদকে কষ্ট দিও না। [তিনি (সা.) খালেদ (রা.)-এরও মন রক্ষা করেন।] সে আল্লাহ্ তা'লার তরবারিগুলোর মধ্যে একটি তরবারি যা খোদা তা'লা কাফের বা অবিশ্বাসীদের ধ্বংসের জন্য কোষমুক্ত করেছেন। এই ভবিষ্যদ্বাণী কয়েক বছর পর অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণতা লাভ করে। খালেদ (রা.) যখন সেনাদলকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন তখন মদীনার সাহাবীরা যারা (সেনাদলের) সাথে যায় নি তারা তার সেনাদলকে ভীতু -কাপুরুষ বলা আরম্ভ করে। এর অর্থ হলো, তোমাদের সেখানেই লড়াই করে মৃত্যুবরণ করা উচিত ছিল। ফিরে আসা উচিত হয় নি। কিন্তু মহানবী (সা.) বলেন, তারা পলায়নকারী নয় (বরং) পুনঃপুনঃ ফিরে গিয়ে শত্রুর ওপর আক্রমণকারী সৈন্যদল। এভাবে তিনি (সা.) সেই ভবিষ্যত যুদ্ধসমূহের ভবিষ্যদ্বাণী করেন যা মুসলমানদের সিরিয়ার সাথে হওয়ার ছিল।

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, পৃ: ৩৩৪-৩৩৬)

আর তখন খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.) নিজের নৈপুণ্যও দেখিয়েছেন।

পতাকার সম্মান ও শ্রদ্ধা সম্পর্কে উল্লেখ করে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এক স্থানে বলেন, জাতিসমূহে পতাকার (প্রতি) পরম সম্মান ও শ্রদ্ধা (প্রদর্শন) করা হয়। কতক সময় শত্রুর কাছ থেকে তাদের পতাকা ছিনিয়ে নিতে অনেক বড়ো আত্মত্যাগ করা হয় আর কতক সময় নিজেদের পতাকা রক্ষার জন্য বড়ো থেকে বড়ো ত্যাগ স্বীকার করা হয়। এটা শিরক বা অংশিবাদিতা নয় বরং রূপক ভাষায় বাবার সামনে পুত্রের উচ্চাসনে বসাকে যেভাবে মানুষ অবৈধ বলে মনে করে, কেননা এতে বাবার অপমান হয়, একইভাবে রূপক ভাষায় জাতির পতাকা ছিনিয়ে যাওয়ার অর্থ হলো, তার মানসম্ভ্রম ধুলোয় মিশে যাওয়া। এ কারণে জাতিসমূহ নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে দেয়, তবুও শত্রুর হাতে তাদের পতাকা চলে যাওয়াকে সহ্য করে না। এ কারণে লিওয়ায়ে আহমদীয়াত (তথা আহমদীয়াতের পতাকা) প্রভৃতি, এমনকি খোদ্দামুল আহমদীয়া-ও নিজেদের পতাকা অক্ষুণ্ন রাখতে এ নিয়ম বানিয়েছে, যেন মর্যাদার খাতিরে খোদ্দাম নিযুক্ত থাকে। যাহোক, তিনি (রা.) লেখেন, কোনো জাতির লোকদের হৃদয়ে যখন তাদের পতাকার প্রতি সম্মান গেড়ে দেওয়া হয় তখন সেটি তাদেরকে এ বিষয়ের জন্য প্রস্তুত করে তোলে, পতাকার মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে যদি প্রাণ বিসর্জনও দিতে হয় নির্দ্বিধায় যেন প্রাণ বিসর্জন দিয়ে দেয়, কেননা তখন সামান্য কাঠ - কাপড়ের প্রশ্ন আসে না, বরং জাতির সম্মান রক্ষার প্রশ্ন দাঁড়ায়- যা রূপকার্থে একটি পতাকারূপে তাদের সামনে বিদ্যমান থাকে। তিনি (রা.) বলেন, আমি পূর্বেও কয়েকবার বলেছি, আমরা সাহাবীদের মাঝেও এরূপ দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। একটি যুদ্ধে একজন মুসলমান সেনাপতির কাছে ইসলামী পতাকা ছিল। তারা আড়ম্বরপূর্ণ পতাকা বানাতেন না, বরং সামান্য একটুকরো কাঠের সাথে কালো কাপড় বেঁধে নিতেন। আর সেটি কালো কাপড়ের হোক কিংবা পতাকার সামান্য কাঠের টুকরো হোক, সে সময় জাতির সম্মানের বিষয় হয়ে দাঁড়াতো। এটি দৃষ্টিপটে থাকত না যে, পতাকা দামি নাকি সস্তা; বরং সেখানে এ বিষয়টি দৃষ্টিপটে রাখা হতো, জাতির সম্মান এই পতাকার সুরক্ষা বিধান করার এর মাঝেই নিহিত। যাহোক, এ যুদ্ধে খ্রিষ্টানরা- অর্থাৎ যাদের সাথে যুদ্ধ চলছিল, বিশেষভাবে সে স্থানে আক্রমণ করে যেখানে মুসলমানদের

যুগ ইমামের বাণী

কেবল মৌখিক বয়াতের অঙ্গীকারের কোনই মূল্য নাই, যে পর্যন্ত দৃঢ়-চিত্ততার সহিত উহার উপর আমল করা না হয়।

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Late Hasan Laskar
From-Kutubuddin Laskar Sb. Banshra, 24 PGS (s)

যুগ ইমামের বাণী

যার মধ্যে ইসলামের সম্মানের জন্য আত্মাভিমান নেই, খোদা তা'লা তার সম্মান ও আত্মাভিমানের পরোয়া করেন না।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১১১)

দোয়াপ্রার্থী: Late Sawkat Ahmad Molla & Jahanara Bibi
From-Sabina Parveen. Banshra, 24 PGS (s)

পতাকা ছিল। হযরত জা'ফরের কাছে এই পতাকা ছিল। আর এটি ছিল মুতা-র যুদ্ধ। তারা যখন আক্রমণ করে তখন হযরত জা'ফরের একটি হাত কেটে যায়। তিনি তৎক্ষণাৎ সেটিকে অপর হাতে নিয়ে নেন। শত্রুরা যখন দেখল, পতাকা আবার উচ্চকিত হয়ে গেছে তখন তারা পুনরায় আক্রমণ করে। ফলাফল এটি দাঁড়ালো, তার অপর হাতটিও কেটে গেল যা দ্বারা তিনি পতাকা ধরে রেখেছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ পতাকাটি দু 'পা দিয়ে সোজা করে রাখেন। এটিও বর্ণনায় এসেছে, বাহু দিয়ে যেহেতু বেশিক্ষণ পতাকা ধরে রাখতে পারছিলেন না তাই তিনি কোনো মুসলমানকে সামনে এগিয়ে এসে পতাকা হাতে নেয়ার জন্য উচ্চৈঃস্বরে ডাক দেন। আর তিনি বলেন, হে মুসলমানেরা! খেয়াল রেখো, ইসলামের পতাকা যেন নীচে না পড়ে যায়। দেখুন! সেটি সামান্য কাপড় বা কাঠের পতাকা ছিল, কিন্তু তিনি সেটির নাম রেখেছেন ইসলামের পতাকা। যদিও সেটি কাঠের এবং সামান্য কাপড়ের পতাকা ছিল, কিন্তু মূলত ইসলামের পতাকা, তাই সেটির সুরক্ষা বিধান আবশ্যক। অতঃপর আরেকজন উচ্চপদস্থ সেনা সামনে অগ্রসর হয়ে সেই পতাকা ধারণ করে। আমার ধারণা, (তিনি নিজের মতামত ব্যক্ত করছেন,) হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ ছিলেন।" বর্ণনা অনুসারে খালিদ বিন ওয়ালিদ ছিলেন না, অন্য একজন সাহাবী ধারণ করেছিলেন। তারপর সেটি খালিদ বিন ওয়ালীদকে প্রদান করা হয়েছিল। খালিদ বিন ওয়ালীদ- যিনি সেই পতাকা নিজ হাতে নেন।

"অতএব দেখো! সামান্য একটি কাপড়ের জিনিস, তুচ্ছ কাঠের জিনিস। আর ইসলামের দৃষ্টিতে এই কাপড় কিংবা কাঠের কোনো বিশেষ মূল্য নেই, কিন্তু জাতিগত মর্যাদার প্রশ্ন এলে ইসলাম এটিকে নিষেধ করে না। তিনি (রা.) বলেন, এটি ইসলামী পতাকা। দেখো! এটি যেন পড়ে না যায় আর মহানবী (সা.)-ও তার একথা অপছন্দ করেন নি, বরং কখনো কখনো মহানবী (সা.) নিজেও এমন বিষয়ের মর্যাদা রক্ষার জন্য তাগিদ দিতেন যে, এই পতাকা কে ধারণ করবে? যেমন কিছু যুদ্ধে তিনি (সা.) বলেন, আমি সেই ব্যক্তিকে পতাকা প্রদান করব যে এর সম্মান প্রতিষ্ঠা করবে আর সাহাবীরাও প্রতিযোগিতামূলকভাবে সেই পতাকা হাতে নেওয়ার চেষ্টা করতেন।" (খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-২৩, পৃ: ৪৭১-৪৭৩)

এই বিবরণ চলমান থাকবে।

আমি সবসময় বলে থাকি, বিশ্বের সার্বিক অবস্থার জন্য দোয়া অব্যাহত রাখুন । বিশেষ করে বর্তমানে পাকিস্তান ও ভারতের মাঝে বিরাজমান পরিস্থিতিকে সামনে রেখে দোয়া করুন।

আল্লাহ তা'লা যেন জুলুমের অবসান ঘটান। নির্যাতিতদের সুরক্ষা করেন। সরকারগুলোকে বিবেকবুদ্ধি দিন যেন যুদ্ধের দিকে অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে শান্তি পূর্ণভাবে বিষয়গুলি নিষ্পত্তি করে। আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলো মেনে চলে। আল্লাহ তা'লা আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকেও তৌফিক দান করুন, যেখানে আজকাল ন্যায়বিচার পাওয়া কঠিন, কিন্তু আল্লাহ তা'লা করুন যেন এই সংস্থাগুলোও তৌফিক দিন এবং উভয় পক্ষের প্রতি সহানুভূতিশীল ও বন্ধুদেরও তৌফিক দান করুন যেন এই দেশগুলোর মধ্যমার বিষয়াদি সমাধান করাতে পারে।

পাকিস্তানের পক্ষ থেকে অবশ্য বলা হচ্ছে এবং তাদের মন্ত্রীদের প্রায়শ বিবৃতি আসে যে, কাশ্মীরে যে সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটেছে এর সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। যদি তোমাদের সন্দেহ থাকে, তাহলে আমাদের লড়াই করার বদলে জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এর তদন্ত করাও, যা হওয়া উচিত।

ভারত সরকারকেও এতে ইতিবাচক মনোভাব দেখানো উচিত। আল্লাহ তা'লা উভয় পক্ষকে বুদ্ধি দিন। যুদ্ধ হলে উভয় পক্ষের ক্ষতি হয় এবং শুধু সৈন্যরা নয়, অত্যাচারিত থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষও অকারণে মারা যায়। এটাই আমরা অধুনা যুদ্ধগুলোতে দেখছি, এটাই ঘটছে। যাই হোক, বিশ্বের সব মজলুমদের জন্য প্রার্থনা করুন। বাহ্যত বিশ্ব ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে বলে মনে হয়। আল্লাহ তা'লা একে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করুন আর এটি তখনই সম্ভব যখন মানুষ আল্লাহ তা'লার দিকে ঝুঁকে পড়বে। আল্লাহ তা'লা তাদের তৌফিক দান করুন এবং আমাদেরকেও দোয়া করার তৌফিক দান করুন।

এখন আমি জুমআর নামাযের পর একজন শহীদের জানাযার নামায পড়াব। এটি মুহাম্মদ আসিফ সাহেব ইবনে রফিক আহমদ সাহেবের। তিনি কাসুর জেলার বলীর এর সদস। ২৪ এপ্রিলে আহমদীয়াতের বিরোধীদের দ্বারা গুলি করে তাকে শহীদ করা হয়। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। শাহাদতের সময় মরহুমের বয়স ছিল উনিশ বছর। তিনি ছিলেন এক যুবক। বিস্তারিত বিবরণ অনুযায়ী, ঘটনার দিন রাত প্রায় সাড়ে দশটায় মুহাম্মদ আসিফ সাহেব তার এক আহমদী প্রতিবেশী আসনান আহমদ সাহেবের সাথে মোটর সাইকেলে গ্রামের বাইরে একটি দোকান থেকে কিছু গৃহস্থালির জিনিস কিনতে গিয়েছিলেন। গ্রামের দোকানদাররা বয়কট করেছিল, তাই কেনাকাটার জন্য বাইরে যেতে হয়েছিল। বাড়ি থেকে প্রায় একশ মিটার দূরে রাস্তায় বিরোধীরা আগে থেকে লুকিয়ে অপেক্ষা করছিল। তারা তাদের দুজনের উপর গুলি করে। মুহাম্মদ আসিফ সাহেবের ডান কাঁধে পিঠের দিকে গুলি লাগে যা আড়াআড়ি ভেদ করে যায়, অন্যদিকে দ্বিতীয় খাদিম আসনান আহমদ সাহেবের বাম পায়ে গুলি লাগে। হামলাকারীরা ঘটনার পরও ভয় ও আতঙ্ক ছড়ানোর জন্য গুলি করতে থাকে। আমাদের এই দুজন খাদিম আহত হওয়া সত্ত্বেও সাহস ও ধৈর্য্য ধরে কাজ নিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে মোটরসাইকেলেই বেরিয়ে আসেন এবং কিছু দূর গিয়ে পড়ে যান। তারা চিৎকার করতে থাকে ন মোটরসাইকেল চালানোর জন্য। পুলিশ ঘটনাস্থলে দেরিতে পোঁছায়, এই সময়ে হামলাকারীদের পক্ষ থেকে গুলির সিরিজ চলতে থাকে, যার কারণে তাদের দুজনকে তাৎক্ষণিকভাবে হাসপাতালে নেওয়া সম্ভব হয়নি। পুলিশ পোঁছানোর পর আসিফ সাহেবকে হাসপাতালে নেওয়া হয়, কিন্তু এই সময়ে বেশি রক্তক্ষরণের কারণে মুহাম্মদ আসিফ সাহেব হাসপাতালে পোঁছানোর পরই শহীদ হন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

ঘটনার মামলা সংশ্লিষ্ট পুলিশ স্টেশন ফুলনগর, জেলা কাসুরে রেকর্ড করা হয়েছে। এখন তাদের মামলা রেকর্ড হওয়ার পর অবস্থা এমনই থাকে, কিছুই করা হয় না। তবে দেখা যাক এখন তারা কী করেতার গুলি লেগেছিল। প্রাথমিক চিকিৎসার পর আল্লাহর কৃপায় সে ভালো আছে।

কসুর জেলার 'বালীর'এ বিগত তিন বছর ধরে প্রচণ্ড বিরোধিতা বিরাজ করছে। ভিত্তিহীনভাবে অপবাদ অরোপ করে বেশ কয়েকবার জামা'তের সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। কয়েকবার আহমদী সদস্যদের মারধর করা হয়েছে। আহমদী কবরস্থানে, মৃতদের কবর থেকে কলেমা ও কুরআনের আয়াত মুছে ফেলা হয়েছে। গ্রামে পূর্ণরূপে বয়কটের পরিস্থিতি বিরাজ করছে। গ্রামের দোকান থেকে জিনিসপত্র কেনার প্রতিবন্ধকতার সাথে সেখানকার পানি বিশুদ্ধকরণের প্লান্ট থেকে পানি নেওয়াও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থেকে আসা-যাওয়ার সময় (আহমদী) ছেলে-মেয়েদের বিরক্ত করা হয়। এ হলো সেখানকার অবস্থা।

মরহুম শহীদের পরিবারে, তার প্রপিতামহ মুকাররম মুহাম্মদ দীন সাহেবের মাধ্যমে আহমদীয়াতের বিস্তার ঘটে। খেলাফতে সানীয়ার কল্যাণময় যুগে ১৯৩৪ সনে সালানা জলসায় তিনি বয়আত করেন। মরহুম শহীদের দাদার নাম মুহাম্মদ ইয়াকুব ছিল।

শহীদ মরহুম, পিতামাতার একমাত্র পুত্রসন্তান ছিলেন। স্বল্পভাষী ও অত্যন্ত সাহসী এবং প্রত্যেকের সাথে ভালোবাসা ও সহানুভূতির সম্পর্ক ছিল। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে নিয়মিত ছিলেন ও জামা'তের কাজে অগ্রগামী থাকতেন। জামা'তের অধীনে খেলাধুলায় অংশগ্রহণে অনেক আগ্রহ রাখতেন। সাম্প্রতিককালে, জেলাভিত্তিক প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। শহীদ মরহুমের মাতা যিনি হৃদরোগে আক্রান্ত, তিনি পূর্ণরূপে তার শুশ্রূষা করতেন। তার মাতা বলেন, মরহুম অত্যন্ত আনুগত্যকারী সন্তান ছিল। আত্মীয়স্বজনের সাথে তার সহানুভূতি ও সৌহার্দ্যের সম্পর্ক ছিল।

তার বোন যাহেদা রাফীক বলেন, আমার ভাই প্রত্যেকের খেয়াল রাখত। সে শাহাদতের বাসনা পোষণ করত। আর আল্লাহ্ তা পূর্ণ করেছেন। শাহাদতের তিন দিন পূর্বে তিনি স্বপ্নে দেখেন, (তার) ভাই গুলিবিদ্ধ হয়েছে। পরবর্তী দিনে ফোন করে খোঁজখবর নেন। শাহাদতের দিনেও খোঁজখবর নেন, কিন্তু সে বলে, ব্যস্ত আছি। সংক্ষিপ্ত কথা হয়েছিল। ভাই বলল, রাতে কথা হবে। কিন্তু সব কথা হয় নি। সে রাতেই সে শহীদ হয়ে আল্লাহ্র সমীপে উপস্থিত হয়ে যায়। তার বোন বলেন, স্বপ্নের কারণে তিনি অত্যন্ত বিচলিত ছিলেন। [হুযূর (আই.)-কে] চিঠিও লিখছিলাম অর্থাৎ দোয়ার জন্য চিঠি লিখছিলেন। তিনি লিখেন, আমি যখন এই বাক্য লিখতে আরম্ভ করব যে, আমি স্বপ্নে দেখেছি গুলিবিদ্ধ হয়েছে, তিনি বলেন, সে সময় আমি সংবাদ পেলাম- আমার ভাই শাহাদতের মর্যাদা লাভ করেছে।

শাহাদতের সময় শহীদ মরহুম, কসুর জেলার মজলিসে আমেলায় নাযেম তাহরীকে জাদীদ ছিলেন। স্থানীয় জামা'তে, নায়েব কায়েদ খোদ্দামুল আহমদীয়া এবং নাযেমে আতফালের দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য লাভ করছিলেন।

এরপর শেষের পাতায়....

মহানবী (সা.)-এর বাণী

অতিথিকে গৃহের দরজা পর্যন্ত গিয়ে বিদায় জানানোও সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত। (সুনান ইবনে মাজা)

দোয়াপ্রার্থী: Late-Azima Khatun,
From- Mirza Enayetulla Sb Harhari, Murshidabad

ঈদুল আযহার খুতবা

কুরবানীর স্মরণে একটি দুম্বা জবাই করার উদ্দেশ্য হচ্ছে ধর্মের ইতিহাসে কিয়ামত পর্যন্ত কুরবানীর এই প্রেরণা ও চেতনা জীবিত থাকা। এই কুরবানীর চেতনাকে জীবিত রাখার জন্যই হজ্জের দিনে মুসলমানরা লক্ষ লক্ষ পশু কুরবানী করে থাকে। আর এই কুরবানী খোদা তা'লার দৃষ্টিতে তখনই প্রকৃত কুরবানী বলে গণ্য হয়, যখন এর পিছনে পিতা-পুত্রের যে বিশ্বস্ততা, সেই বিশ্বস্ততা অন্তর্নিহিত থাকে। আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য পুণ্য অর্জন যেন এই কুরবানীর উদ্দেশ্য হয়। তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে খোদা তা'লা সন্তুষ্টি অর্জনে সব কিছু উৎসর্গ যেন মূল উদ্দেশ্য হয়। এটি যদি না থাকে বাহ্যিক কুরবানী কোনই মূল্য রাখে না।

সকল আহমদীদের জন্য এই ঈদ যেন অশেষ বরকত ও কল্যাণময় হয়। পৃথিবীতে সার্বিকভাবে শান্তির রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হোক।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ১৭ই জুন, ২০২৪, এর জুমআর খুতবা (২৫ শাহাদাত, ১৪০৪ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আজ আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে ঈদুল আযহা উদযাপিত হচ্ছে। এটিকে পাক ভারত উপমহাদেশে কুরবানীর ঈদও বলা হয়। এই ঈদ উপলক্ষ্যে হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর সুন্নত অনুসরণ করে অসংখ্য পশু কুরবানী করা হয়। হজ্জের সময় হাজীগণ মক্কাতে লক্ষ লক্ষ পশু কুরবানী দিয়ে থাকেন। এই কুরবানী এমন একটি ব্যবহারিক আমল যা খোদা তা'লার প্রতি হযরত ইব্রাহিম (আ.) ও হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর পরিপূর্ণ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা এবং আল্লাহ্র প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করতে গিয়ে নিজ প্রাণ এবং নিজ সন্তানের জীবন কুরবানী করার মুহূর্তটি স্মরণ করার জন্য করা হয়ে থাকে। পিতা-পুত্র যখন সত্যিকার অর্থে এক স্বপ্নের ভিত্তিতে গলায় ছুরি চালাতে প্রস্তুত হয়ে যান, তখন খোদা তা'লা বলেন, তোমরা নিজেদের বিশ্বস্ততা ও অঙ্গীকার পূর্ণ করে দেখিয়েছ। তোমাদের মাঝে উন্নত পর্যায়ের বিশ্বস্ততা আছে কিনা সেটি পরীক্ষা করাই উদ্দেশ্য ছিল; জবাই করা নয়। এই কুরবানীর স্মরণে একটি দুম্বা জবাই করার উদ্দেশ্য হচ্ছে ধর্মের ইতিহাসে কিয়ামত পর্যন্ত কুরবানীর এই প্রেরণা ও চেতনা জীবিত থাকা। এই কুরবানীর চেতনাকে জীবিত রাখার জন্যই হজ্জের দিনে মুসলমানরা লক্ষ লক্ষ পশু কুরবানী করে থাকে। আর এই কুরবানী খোদা তা'লার দৃষ্টিতে তখনই প্রকৃত কুরবানী বলে গণ্য হয়, যখন এর পিছনে পিতা-পুত্রের যে বিশ্বস্ততা, সেই বিশ্বস্ততা অন্তর্নিহিত থাকে। আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য পুণ্য অর্জন যেন এই কুরবানীর উদ্দেশ্য হয়। তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে খোদা তা'লা সন্তুষ্টি অর্জনে সব কিছু উৎসর্গ যেন মূল উদ্দেশ্য হয়। এটি যদি না থাকে বাহ্যিক কুরবানী কোনই মূল্য রাখে না। যদি আমরা গভীর দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিষয়টিকে লক্ষ্য করি, হাজার হাজার বা লক্ষ লক্ষ মানুষ যে কুরবানী করে তাতে বিশ্বস্ততা, সততা এবং তাকওয়ার অনেক ঘাটতি দেখতে পাই। অনেক দেশে কুরবানীর পশু অনেক সাজিয়ে গুছিয়ে বাজারে নিয়ে আসা হয় আর এগুলির অনেক বড় বড় মূল্য চাওয়া হয় আর গর্ব করা হয় যে আমরা এত হাজার কিম্বা এত লাখ টাকার পশু ক্রয় করেছি। ত্যাগ ও কুরবানীর যে প্রেরণা তা অহংকারের আবরণে ঢাকা পড়ে যায়।এটি হল বস্তুবাদী লোকদের অবস্থা। প্রকৃত কুরবানীর সাথে এদের দূরতম সম্পর্ক নেই। নামধারী আলেমরা ধর্মের নামে মানুষের মনমস্তিষ্ক কলুষিত করে রেখেছে। পাকিস্তানে ধর্মের ব্যপারে তারা এত ঘৃণ্যভাবে মানুষের মনমস্তিষ্কে আসন গেড়ে বসে আছে যে, এর জন্য তারা যে কোন প্রকার জুলুম ও অত্যাচার করতে পারে। বিশেষভাবে আহমদীদের সর্বদা অত্যাচার ও অনাচারের লক্ষ্যে পরিণত করে থাকে। মৌলভীদের দৃষ্টিতে আহমদীদের ঈদের নামায পড়া ও পশু কুরবানী করা মারাত্মক অপরাধ। যার শাস্তির জন্য তারা যে-কোন নোংরা পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। এগুলো শুধু কথার কথা নয় বরং সাধারণ মুসলমানদের তারা বলে, আহমদী যারা নামায পড়ে বা কুরবানী করে তাদের সাথে যে-কোন আচরণ করতে পার তা তোমাদের জন্য বৈধ। শুধু বৈধই নয়, বরং তা তোমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। তাই তাদের সাথে তুমি যা খুশি করতে পার, এমনকি হত্যাও করতে পার। এর ফলাফল স্বরূপ সেখানে আহমদীদেরকে বিভিন্ন সময়ে শহীদ করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, কোন কোন স্থানে প্রশাসন নামধারী মোল্লাদের উসকানীতে নামায পড়া অথবা কুরবানী করার অপরাধে আহমদীদের কারাগারে নিক্ষেপ করছে। বিগত বছরগুলোতে এমনই হয়েছে। এবার মনে হচ্ছে প্রশাসনের মাঝে খানিকটা কোমলতা এসেছে বা অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে তা সত্ত্বেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রশাসন আহমদীদের উপর অত্যাচার নির্যাতন চালাচ্ছে। কোথাও কোথাও স্থানীয় সরকারের উপর মৌলবীদের এতটা প্রভাব রয়েছে যে, তারা বিশ্বাস করে আহমদীদের উপর অত্যাচার নিপীড়ন চালালে সত্যিই তাদের জন্য জান্নাতের পথ খুলে যাবে। তারা সর্বোচ্চ চেষ্টা করে কোনভাবে আহমদীদেরকে ইবাদত করতে এবং কুরবানী দিতে যে কোনও উপায়ে বাধা দেওয়া যায়। কিন্তু তারা জানে না, প্রকৃত কুরবানী গ্রহণকারী হলে ন আল্লাহ্ তা'লা। অথচ এরা আহমদীদের কুরবানী করতে বাধা দেয়, আহমদীরা নিজেদের আবেগ অনুভূতির উপর ছুরি চালিয়ে আর পশু কুরবানী করা থেকে বিরত থাকে। আল্লাহ্ তা'লা যিনি অন্তর্যামী, এ বিষয়টি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন যে, এ কারণে আহমদীরা কতটা মানসিক কষ্টে নিপতিত। তিনি অবশ্যই আহমদীদের সকল কুরবানীকে কবুল করবেন। এমন আহমদীরা যেন নিজেদের আবেগ অনুভূতিকে খোদা তা'লার চরণে নিবেদন করেন যেন তিনি অতিসত্বর তার দয়া ও কৃপার দৃষ্টি আমাদের উপর দেন। আল্লাহ্ তা'লা নির্যাতিতদের দীর্ঘশ্বাস শ্রবণ করে থাকেন। তিনি আহমদীদের এই সকল কুরবানীকে তাদের মুখের উপর ছুড়ে মারবেন। যদি খোদা তা'লা কোন ব্যক্তির পুণ্যের কারণে সে হজ্জে না যাওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র হজ্জে যাওয়ার নিয়তের কারণে তার হজ্জ কবুল করতে পারেন, আর লক্ষ লক্ষ তাওয়াফকারীদের হজ্জ কবুল না হয়ে থাকে তাহলে সেই একই খোদা আহমধীদের এই আন্তরিক আবেগ-অনুভূতি ও মানসিক কষ্টকে গ্রহণীয়তার যোগ্যতার মর্যাদা দিয়ে হাজার হাজার আহমদীর কুরবানী কবুল করবেন, যারা কুরবানী করার নিয়্যত করেছে। আর এই সব নামধারী মৌলভীদের অন্ধ অনুসারীদের বাহ্যিক কুরবানীকে তাদের মুখে ছুড়ে মারতেপারেন। তাই এমন কঠিন সময়ে আহমদীদের তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে দোয়ার মাঝে নিজেদের সময় অতিবাহিত করা উচিত।

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, "কুরবানীর রক্ত ও মাংস খোদার কাছে পৌঁছয় না, পৌঁছয় তোমাদের তাকওয়া।"

তাই একথা বুঝতে হবে প্রকৃত বিষয় হল তাকওয়া বা খোদাভীতি, যা খোদা তা'লা কর্তৃক গৃহীত হয়;কুরবানী রক্ত বা মাংস খোদা পর্যন্ত পৌঁছয় না। এই চেতনা আজ আহমদীরাই প্রকৃত অর্থে অনুধাবন করতে পারে। তাদের কুরবানী করতে দেওয়া হোক বা না হোক তারা এই চেষ্টায় নিয়োজিত আছে যে, তাকওয়ার ক্ষেত্রে কীভাবে উন্নতি করা যা। তাই এই রূহ বা চেতনা প্রত্যেক আহমদীর মাঝে থাকা উচিত। কুরবানী করতে বাধা দেওয়ার কারণে সকলেই ভিতরে ভিতরে মর্মযাতনায় ভোগেন, তথাপি তাদের মাঝে যদি তাকওয়া বা খোদা ভীতি থাকে তবে আল্লাহ্ তা'লা তাদের এই সদিচ্ছাকে গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদা দিয়ে পুণ্যের ভাগী করবেন।হতভাগা মৌলবীদের মাঝে এসব কিছু নেই। তাদের চালচলন ও কুকীর্তি থেকে বোঝা যায় যে, তাদের হৃদয় তাকওয়া শূন্য। এরা আহমদীদেরকে কষ্ট দেওয়া এমনকি হত্যা করাকেও ইসলামের সেবা বলে মনে করে। খোদা তা'লার নির্দেশ মেনে চলার সঙ্গে তাদের দূরতম সম্পর্ক নেই। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, যারা কলেমা পাঠকারী তারা মুসলমান।তারা

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: "সর্বদা সত্য কথা বল, যখন তোমাদের কাছে আমানত রক্ষিত হয়, তখন তা আত্মসাৎ করিও না এবং প্রতিবেশীর সহিত সর্বদা সদয় আচরণ কর।" (বাইহাকি ফি শোবিল ঈমান)

দোয়াপ্রার্থী: Sadique Mahdi Hasan, Bithari, 24 PGS (N)

বলে আহমদীরা মন থেকে কলেমা পাঠ করে না। এরা কি কোন আহমদীর হৃদয় চিরে দেখেছে। মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তুমি সেই ব্যক্তির হৃদয় চিরে দেখেছ যাকে তুমি হত্যা করেছ। তুমি কি দেখেছ সে মৃত্যুর ভয়ে কলেমা পাঠ করেছে নাকি খোদার ভয়ে? এসকল নাম সর্বস্ব উলেমারা এসব কথা বোঝে না আর তাদের পক্ষে বোঝাও সম্ভব নয়। কেননা তারা মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা মান্য করার পরিবর্তে নিজেদের বানানো ধর্মের প্রচার ও প্রসার করতে চায়।

এরপর আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, যে ব্যক্তি মোমেন হওয়ার দাবি করে আর যে কলেমা পাঠ করে তাকে যে হত্যা করবে সে খোদার হাতে ধরা পড়বে এবং জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। তারা কি খোদার শাস্তি এড়াতে পারবে? এরা যদি বিবেক বুদ্ধি খাটাতো তাহলে কতই না ভাল হতো! হায়! তারা যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের নির্দেশের উপর আমল কার চেষ্টা করত। যারা সত্যিকার অর্থে ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত, নিষ্ঠাপূর্ণ মানসিকতা নিয়ে নিজেদের প্রাণ ও অর্থ, নিজেদের আবেগ-অনুভূতি খোদার পথে উৎসর্গ করছেন তাদের কুরবানী বা আমল অবশ্যই খোদার দরবারে কবুল হবে। এটিও ত্যাগ ও কুরবানীর একটি যুগ, অচিরেই যার অবসান হবে। তাই আহমদীদের উচিত এমতাবস্থায় খোদার দরবারে আরও বেশি আকুতি মিনতি সহকারে এতটা অবনত হওয়া যেন খোদার কৃপা ও অনুগ্রহ অচিরেই নির্যাতিতদের সাহায্য সহযোগিতার জন্য ছুটে আসে। আর অত্যাচারীদের পাকড়াও করে। হুযুর বলেন, আল্লাহর কাছে বলুন, হে আল্লাহ্ তোমার নির্দেশ অনুসারে আমরা ইব্রাহিম (আ.)-এর সুন্নতের উপর আমলকারী আর মুহাম্মদ (সা.)-এর পূর্ণ আনুগত্যের মধ্য দিয়ে সকল প্রকার কুরবানী করতে আমরা প্রস্তুত, এমনকি নিজেদের প্রাণ, সম্পদ ও আবেগ অনুভূতির কুরবানী করতেও আমরা প্রস্তুত। কুরবানীর পশু জবাই হোক বা না হোক, এসবের কুরবানী করারও আমরা আকাঙ্খা রাখি। এমনটি যদি হয় তাহলে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দোয়া ও নিয়্যতকে গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদা দিবেন। আর আমাদের কুরবানীকে নিজ প্রতিশ্রুতি অনুসারে তিনি কবুল করবেন। হ্যাঁ শর্ত হল, তাকওয়া; যদি আমরা তাকওয়ার ভিত্তিতে আমাদের জীবন অতিবাহিত করি, আল্লাহ্ তা'লা ও তার বান্দার অধিকার আদায় করতে পারি তাহলে ইনশাআল্লাহ্ আমরা পৃথিবীতে প্রকৃত বিপ্লব আনতে পারব। এই দুনিয়ার কীট বস্তুপূজারী মৌলবীরা কোন কিছুরই পরিবর্তন করতে পারবে না। আমরা আল্লাহর ফজলে এমন জামাত; যে জামাত খোদা তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুসারে এবং মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে হযরত মসীহ (আ.)-এর বয়আতের কল্যাণে পৃথিবীতে বিপ্লব সাধনকারী। আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে হযরত ইব্রাহিম (আ.) ও হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর কুরবানীর উদ্দেশ্য ছিল বিপ্লব সাধন করা। সেই বৈপ্লবিক পরিবর্তন যার মাধ্যমে পৃথিবীর ভাগ্য পরিবর্তন করার কথা ছিল। যা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে হওয়ার কথা ছিল। হযরত ইসমাঈলের স্থানে একটি দুম্বা কুরবানী মূলত কুরবানীর একটি বাহ্যিক রূপ ছিল। যার মাধ্যমে তো কোন বিপ্লব সাধিত হয় নি। দুম্বা কুরবানী একটি বাহ্যিক বহিঃপ্রকাশ ছিল যা এখনও প্রচলিত আছে যেন মু'মিন সেই অনুভূতি ও উদ্দেশ্যকে ভুলে না যায়।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন: হৃদয়ের পবিত্রতাই প্রকৃত কুরবানী, পশুর রক্ত প্রকৃত কুরবানী নয়। সাধারণ মানুষ পশু জবাই করে আর প্রকৃত বান্দারা নফসের কুরবানী করে থাকে। কিন্তু বাহ্যিক কুরবানী করা থেকেও খোদা তা'লা বিরত রাখেন নি। এর কারণ হল যেন এটি উপলব্ধি করা যায় যে যে এসব কুরবানীর সাথেও মানুষের সম্পর্ক আছে। অন্য স্থানে তিনি বলেছেন: 'আল্লাহ্ তা'লা ইসলামী শরীয়তে অনেক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার জন্য বাহ্যিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। মানুষের জন্য নির্দেশ হল, সে যেন সমস্ত শক্তি দিয়ে আল্লাহ্র পথে উৎসর্গিত হয়। বাহ্যিক কুরবানীকে এজন্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ রাখা হয়েছে কিন্তু প্রকৃত কুরবানী হল হৃদয়ের কুরবানী। অতএব, এই প্রেরণা ও চেতনা আমাদের ও আমাদের পরিবারের সদস্যদের মাঝে, আমাদের সন্তান-সন্ততি ও ভবিষ্যত প্রজন্মের মাঝে সৃষ্টি করতে হবে। সমষ্টিগতভাবে আমাদের সবার মাঝে যদি এই প্রেরণা সৃষ্টি হয় তাহলে সেই সত্যিকার বিপ্লব আসবে যে বিপ্লব সাধনের জন্য হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর দাসত্বে প্রেরণ করেছেন। এসব মৌলবীদের ক্ষণস্থায়ী অপচেষ্টার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে আমরা সামনে এগিয়ে যাব ইনশাআল্লাহ্। এটি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর প্রতি আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি। আর অবশ্যই তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন। তোমাদের চিন্তিত হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই যে, সরকারের কিছু অত্যাচারী কর্মকর্তা মৌলবীদের হাতে হাত মিলিয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করে আমাদের ঈদ করা বা কুরবানী করা থেকে বাধা দিচ্ছে আর অতীতে দিয়েছে। তারা এতটা ত্রাস সৃষ্টি করছে যে, আহমদীরা প্রকাশ্যে ইবাদতও করতে পারে না, কুরবানীও করতে পারে না। যদি শুধু বাহ্যিক কুরবানীর প্রশ্ন হত তাহলে প্রশ্ন হল অন্য জাতির মাঝেও কুরবানীর প্রচরণ আছে, এসব কুরবানীর মাধ্যমে তারা কি খোদার নৈকট্য অর্জন করতে পেরেছে? মোটেও নয়। কেননা তাদের মাঝে তাকওয়া নেই। আজকে নামধারী মোল্লাদের অবস্থাও একই। যারা ইসলাম নামক শান্তির ধর্মকে নিজেদের হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য এটিকে একটি উগ্রধর্মকে পরিণত করেছে। খোদার ভয় বিন্দুমাত্র তাদের মাঝে নেই। যেভাবে আমি বলেছি, একদিন আল্লাহ্ তাদের অবশ্যই পাকড়াও করবেন।আল্লাহ্ তা'লা যতটা অবকাশ দেন, তাঁর শাস্তি তত কঠোর হয়। এরা খোদার ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু যেভাবে আমি বলেছি, এমতাবস্থায় আমাদেরকে পূর্বের তুলনায় খোদার দরবারে অধিক বেশি বিনত হয়ে নিজেদের তাকওয়ার মান উন্নত করতে হবে। আর এটিই হযরত ইব্রাহিত ও ইসমাঈল (আ.)-এর কুরবানীকে জীবিত রাখার উপায়। সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য এটিই মাধ্যম, যে কারণে আল্লাহ তা'লা ইসমাঈর (আ.)-এর বংশে মুহাম্মদ (সা.)-এর মত মহান রসূল প্রেরণ করেছেন অর্থাৎ পৃথিবীতে এক খোদার রাজত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য।

তাকওয়ার উন্নত মান অর্জনের জন্য হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর জামাতকে নসীহত করতে গিয়ে বলেন, "আমাদের জামাতের জন্য বিশেষভাবে তাকওয়ার প্রয়োজন। বিশেষকরে এই বিষয়টিকে দৃষ্টিতে রাখা উচিত যে, তারা এমন একজন বিশেষ ব্যক্তির সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং তার হাতে বয়আত করেছে যিনি মামুর হওয়ার দাবি করেছেন। যারা হিংসা-বিদ্বেষে লিপ্ত ছিল বা যেমনই বস্তুবাদী হোক না কেন আমরা শিরকে লিপ্ত থাকি না কেন, তার কল্যাণে এখন তারা মুক্তি লাভ করবে। তিনি (আ.) বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি অসুস্থ হয়, রোগের মাত্রা সামান্য হোক বা বেশি যদি রোগের চিকিৎসা না করা হয়, যদি সুস্থ হওয়ার জন্য পূর্ণ চেষ্টা না করে তবে অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ হতে পারে না। মুখে একটি কালো দাগ বের হলে তা বড় দুশ্চিন্তার কারণে পরিণত হয়, কোথাও এই কালো দাগ ধীরে ধীরে পুরো মুখে না ছেয়ে যায়। তেমনি পাপেরও একটি কালো দাগ হৃদয়ে রয়েছে। তিনি (আ..) বলেন: এটি মনে করো না যে খোদা তা'লা দুর্বল। তিনি সকল ক্ষমতার অধিকারী। কোন বিষয়ে যদি তার উপর নির্ভর করো, তিনি অবশ্যই তোমাদের সাহায্য করবেন। وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ (সূরা আত তালাক: ০৪)

কিন্তু এই আয়াতে সর্বপ্রথম যাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছিল তারা ধর্মের পূর্ণ অনুসারী ছিলেন। খোদা তা'লা তাদের নিশ্চয়তা দিচ্ছেন, আমি তোমাদের সাথে আছি। তাকওয়ার যে কল্যাণ রয়েছে এর মধ্যে একটি হল, আল্লাহ্ তা'লা মুত্তাকীকে সেই সব সমস্যা থেকে পরিত্রাণ দিয়ে থাকেন, যেগুলো তাদের ধর্মের পথে অন্তরায় হয়ে থাকে। পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, "তাকওয়ার পথ অবলম্বন করা উচিত কারণ তাকওয়াই এমন একটি বিষয় যেটিকে শরিয়তের সারবস্তু বলা হয়ে থাকে। যদি কেউ শরীয়তকে সংক্ষেপে বর্ণনা করতে চায়,তাহলে শরীয়তের সারমর্ম হচ্ছে তাকওয়া। তাকওয়ার অনেক স্তর কিম্বা প্রকারভেদ রয়েছে। কিন্তু যদি আন্তরিকভাবে অনুসন্ধিৎসু হয়ে এর অর্থাৎ তাকওয়ার প্রাথমিক স্তরগুলো নিষ্ঠা এবং সততার সাথে অতিবাহিত করে তবে সে ন্যায় পরায়ণতার মহান স্তরে পৌঁছে যেতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন- إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ (আল মায়েদা: ২৮)

অর্থাৎ আল্লাহ্ মুত্তাকিদের দোয়া কবুল করেন। এটি খোদার প্রতিশ্রুতি। আর খোদার প্রতিশ্রুতি অটল। যেমন আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন- إِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ (সুরা আলে ইমরান: ১০)

তাকওয়া গৃহীত হওয়ার একটি পূর্বশর্ত। তাই মানুষ যদি উদাসীনতা বা পথভ্রষ্টতার পথে পা না বাড়িয়ে আশা করে তার দোয়া গৃহীত হবে তবে সে কি নির্বোধ ও আহাম্মক নয়? তাই আমাদের জামাতের উচিত, যথাসাধ্য তাকওয়অর পথে পদচারণা করা যেন তারা দোয়া গৃহীত হওয়ার স্বাদ বা আনন্দ লাভ করতে পারে। এভাবে প্রকৃত মু'মিনের ঈমান আরও বৃদ্ধি পায়। এটি সেই বিষয় যাকে আমাদের জীবনের অংশে পরিণত করা উচিত। যদি এটি সম্ভব হয় তাহলে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আগমণের উদ্দেশ্য পূরণে আমরা ভূমিকা রাখতে পারব। ইমাম মাহদী (আ.)-এর সেই মিশনকে আমরা দুনিয়াতে প্রসারিত করতে পারবো যে মিশন হযরত মুহাম্মদ (সা.) দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেণ। এর জন্য সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকারে আমাদের প্রস্তুত থাকা উচিত। এসব মৌলবীরা অপকর্ম করে কখনও আমাদের উদ্দেশ্য অর্জনে বাধ সাধতে পারবে না। সর্বদা মনে রাখবেন আমাদের

মহান আল্লাহ্র বাণী

নিশ্চয় আল্লাহ্ তিনি, যিনি পরম রিয্কদাতা, শক্তির অধিকারী, সুদৃঢ়। (আয যারিয়াত: ৫৯)

দোয়াপ্রার্থী: Late Abu Bakar Siddiq & Manjuara Mandal,
From- Abu Hasan Mondol . Bithari, 24 PGS (N)

জীবনের এক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আছে আর সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করা উচিত।এসব বাধা ও প্রতিকূল পরিবেশ আমাদেরকে আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে উন্নীত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে কুরবানী করার সুযোগ যারা পাচ্ছেন তাদের স্মরণ রাখা উচিত; তাকওয়ার পথে অবগাহন করে পৃথিবীতে এবং নিজের মাঝে এক বিপ্লব আমরা সাধন করব। যাদেরকে কুরবানী করতে বাধা দেওয়া হয়েছে; যেমনটি পাকিস্তানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে; তাদের উচিত খোদা তা'লার দরবারে পূর্বের তুলনায় আরও বেশি অবনত হওয়া। আল্লাহ তা'লা আমাদের আবেগ অনুভূতির কুরবানী ও সম্পদের কুরবানীকে কবুল করে আমাদের অতিসত্বর পৃথিবীতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সাক্ষী করুন। সর্বদা স্মরণ রাখবেন জামাতের ১৩৫ বছর অধিককাল বিরোধিতা হয়ে আসছে। এসব বিরোধিতা জামাতকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। এখনও ইনশাআল্লাহ্ এর পদযাত্রা উন্নতির দিকে অবগহন করবে। আমাদের প্রাণ, সম্পদ, সময় ও সম্মানের কুরবানী সর্বদা ফলপ্রসু হচ্ছে আর ভবিষ্যতেও উত্তম ফলাফল বয়ে নিয়ে আসবে। এই চেতনা আপনাদের সন্তানদের মাঝে সৃষ্টি করুন। কোন বিরোধিতায় ভীত হবেন না। একনিষ্ঠভাবে খাঁটি হৃদয়ে খোদা তা'লার দরবারে বিনত হও। খোদা তা'লার সন্তুষ্টি সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখতে হবে এটি যদি হয়, কেবল তখনই আমরা এক অদ্বিতীয় খোদার জন্য পৃথিবীতে তৌহিদ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হব। আর মুহাম্মদ (সা.)-এর পতাকা পৃথিবীতে উড্ডীয়মান রাখতে সক্ষম হব। ইনশাআল্লাহ্॥ এসব মৌলবীরা মুহাম্মদ (সা.)-এর নাম অন্যায়ভাবে ব্যবহার করে পৃথিবীর মানুষকে ইসলাম ও মহানবী (সা.) থেকে দূরে ঠেলে দেওয়ার কারণ হচ্ছে। সত্যিকার অর্থে আমরাই এক জামাত যারা জগদ্বাসীকে মহানবী (সা.)-এর পতাকা তলে সমবেত করার কাজ করে যাচ্ছি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে কুরবানী ও তাকওয়ার মর্ম বুঝে আমাদের লক্ষ্য অর্জনের তৌফিক দান করুন। পৃথিবীর আহমদীদের জন্য এই ঈদকে সকল অর্থে বরকতময় করুন। আমাদের কুরবানীর ফলাফল স্বরূপ পৃথিবীর মাঝে এক বিপ্লব অচিরেই আমরা যেন দেখতে পাই এটিই দোয়া থাকবে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে। পাকিস্তানের আহমদীদেরকেও আমি ঈদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। গত কয়েকদিন থেকে তাদের দিকেই আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে।সেখানে পরিস্থিতি খুবই প্রতিকূল। আল্লাহ্র কাছে আমাদের দোয়া থাকবে তাদের এই কুরবানী যেন অচিরেই ফল বহন করে। আজ অর্থাৎ ঈরে দিন রাতে কোটলীতে তারা মসজিদে হামলা করে ভাঙচুর করেছে। কোথাও কোথাও আহমদীদের ঈদের নামায পড়তে দেওয়া হয় নি।প্রশাসনের দুর্বলতা বা যে কোন কারণেই হোক এটি ঘটেছে। যাইহোক শুনেছি- সরকার বলেছে, যেন আহমদীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু স্থানীয় প্রশাসন এদের ইচ্ছামত আচরণ করে। আমরা শতভাগ নির্ভর করি আমাদের আল্লাহর উপর। তার দিকেই আমরা বিনত হই। খোদার কাছে দোয়া থাকবে, আহমদীদের হৃদয়ের বেদনা যেন অচিরেই আনন্দে পরিবর্তিত হয়। পৃথিবীতে যেখানে আহমদীরা কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করছেন তাদের সকলের জন্যই আল্লাহ্ তা'লা অচিরেই স্বাচ্ছন্দ্য ও সহজসাধ্যতা সৃষ্টি করুন। স্মরণ রাখবেন, সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র দরবারে বিনত হোন। নিজেদের ইবাদতের মান ক্রমাগত উন্নত করুন, শহীদ পরিবারকে দোয়ায় স্মরণ রাখবেন। খোদা শহীদদের রক্তের প্রতিটি বিন্দুকে এমন স্নেহের দৃষ্টিতে দেখুন যেন এক অসাধারণ বিপ্লবের আগমণ হয়। খোদার কাছে এই দোয়াই থাকবে যে, শহীদদের কুরবানী যেন তাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের মাঝে এক বিপ্লব সাধন করে। তারা যেন পূর্বের চেয়ে ধর্মের সাথে বেশি সম্পৃক্ত হয়। বন্দীদের মুক্তির জন্য দোয়া করুন, বিশেষভাবে ইয়েমেনের সেই ভদ্রমহিলার জন্য। অন্যদের জন্যও দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করুন, অচিরেই যেন তারা মুক্তি পায়। যেভাবেই কোন আহমদী কোন স্থানে ত্যাগ স্বীকার করছে আল্লাহ্ তা'লা তাদের অশেষ কল্যাণে ভূষিত করুন। সকল আহমদীকে আল্লাহ্ তা'লা তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন।ফিলিস্তিনিদের জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন তাদেরকেও অত্যাচারের জাঁতাকল থেকে মুক্ত করেন। সকল আহমদীদের জন্য এই ঈদ যেন অশেষ বরকত ও কল্যাণময় হয়। পৃথিবীতে সার্বিকভাবে শান্তির রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হোক। জগতবাসী যেন, তওহীদ খোদাকে চিনতে পারে। কেবল তখনই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এখন দোয়া করুন।

****

যুগ ইমামের বাণী

পরনিন্দা ও পরচর্চা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা উচিত।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড,পৃ: ৪০৭)

দোয়াপ্রার্থী: Mirza Naeema Begum & Family
Bithari, 24 PGS (N)

'যিকরে ইলাহী (আল্লাহ্র স্মরণ)'

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, 'প্রিয়তম ভাই ও বোনেরা, চিন্তা করেদেখ! মহানবী (সা.)-এর সাহাবীগণ রাযিআল্লাহু আনহুম কী এইজন্য অবিশ্বাসীদের ওপর বিজয় লাভ করেছিলেন যে, তারা উন্নত মানের খাদ্য ও পানীয় সমৃদ্ধ এক বিলাসিতার জীবন যাপন করেছেন? অবশ্যই না। এটি পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থেও বলা ছিল যে, তারা রাতে নামাযে দণ্ডায়মান হবেন এবং দিনে প্রায়ই রোজা রাখবেন। তারা তাদের রাতগুলো খোদা তা'লার স্মরণে এবং ধ্যানে অতিবাহিত করবেন। এছাড়া আর কীভাবে তারা তাদের জীবন কাটিয়েছেন?'মহানবী (সা.) বলেন, "সেই গৃহের দৃষ্টান্ত যেখানে আল্লাহ্কে স্মরণকরা হয় আর সেই গৃহের দৃষ্টান্ত যেখানে আল্লাহ্কে স্মরণ করা হয় না, জীবিত এবং মৃত ব্যক্তির (মাঝে পার্থক্যের) ন্যায়।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, "তুমি কতক ব্যক্তিকে দেখবে যে, তারা সুফিবাদী কাব্য-কবিতা শুনে আনন্দ উচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে, কোনো সাপ যদি বাঁশির সুরে মোহিত হয় তবে কী তুমি সেই সাপকে পবিত্র বলবে বা যদিকোন উট কোনো মোহনীয় কণ্ঠ শুনে মাদকাসক্তের মতো হয়ে যায় তবে কী তুমি সেই উটকে খোদাপ্রাপ্ত বলবে? সত্যবাদিতার পরম মার্গ যা খোদা তা'লার সন্তুষ্টিরও কারণ হয় তা এই যে, কেউ যেন তাঁর প্রতি সদা বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করে।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "একটা সময় ছিল যখন আমরা মনে করতাম যে, পবিত্র কুরআন মুসার লাঠিরমত জীবিত, কিন্তু যখন আমরা বিষয়টিতে দ্বিতীয়বার মনোনিবেশ করলাম, তখন আমরা দেখলাম যে, এটি কেবল জীবিত নয়, বরং এর প্রতিটি শব্দের মধ্যে মসীহ্ী জীবন-দানকারী শক্তিও বিদ্যমান।"

সহীহ বুখারীতে এই হাদীসে কুদসীর উল্লেখ আছে, 'মহান আল্লাহ্ বলেন যে, নফল ইবাদতের ফলে আমার বান্দা আমার পরম নৈকট্য অর্জন করে। আমি তার কান হয়ে যাই যার মাধ্যমে সে শুনে। আমি তার চোখ হয়ে যাই যার দ্বারা সে দেখে। আমি তার হাত হয়ে যাই যার মাধ্যমে সে ধরে। আমি তার পা হয়ে যাই যাদিয়ে সে হাঁটে। সে যখন আমার কাছে দোয়া করে আমি তা কবুল করি। সে যখন আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে আমি তাকে আশ্রয় দিই।'

হুযূর (আই.) বলেছেন, "আপনি কী নিজের ভালবাসার সন্তানকে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করতে পারেন? আল্লাহ্ হলেন ভালবাসার পরম উৎস। তাহলে যারাতাঁকে ভালবাসে এবং যাদের প্রতিটি কথা আল্লাহ্র ভালবাসায় নিমজ্জিত তিনি কীভাবে তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করবেন?"

প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) বলেন,

"জামা'তের সদস্যদের নিরাশ হওয়া যাবে না। আমি বিশ্বাস করি- আল্লাহ্র সাহায্য এবং দয়া ছাড়া একজন তার হাতের আঙ্গুলও নাড়াতে পারবে না। কিন্তু মানুষের দায়িত্ব হল নিজ সাধ্যমতো সর্বাত্মক চেষ্টা করা। 'আল্লাহ্র কাছে এজন্য সাহায্য প্রার্থনা করা। 'আল্লাহ্র প্রতি কখনও নিরাশ হওয়া যাবে না। কারণ একজন মু'মিন কখনও হতাশাগ্রস্ত হয় না। এ সম্বন্ধে আল্লাহ্ নিজেই বলেছেন 'আল্লাহ্র রহমত হতে নিরাশ হয়ো না, কারণ 'আল্লাহ্র রহমত হতে কাফের জাতি ব্যতীত কেউ আদৌ নিরাশ হয় না। (সূরা ইউসুফ: ৮৮)।' অর্থাৎ কেবল কাফেররাই 'আল্লাহ্র রহমত হতে নিরাশ হতেপারে। হতাশা সবচেয়ে নিকৃষ্ট জিনিস। প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি সর্বশক্তিমান 'আল্লাহ্রপ্রতি কুধারণা পোষণ করে সে-ই 'আল্লাহ্র ক্ষমার প্রতি নিরাশ হয়ে যায়।"আল্লাহ্র প্রতিষ্ঠিত এই ঐশী জামা'ত কতই না সুন্দর! খেলাফতের মাধ্যমে আল্লাহ্ সকল আহমদীর হৃদয়কে ভালবাসার মাধ্যমে একই বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। এরফলে তারা একটি দেহে পরিণত হয়েছে। ঐশী অনুগ্রহ এবং খেলাফতের বরকতেরকল্যাণে অতীতে ইসলামের উন্নতি হয়েছে, বর্তমানেও হচ্ছে এবং আগামীবছরগুলোতেও এই উন্নতির ধারা অব্যাহত থাকবে, ইনশাআল্লাহ্, আমীন।আমাদের হৃদয় হল একপ্রকার উর্বর মাটি। এখানে যা বপন করা হবে সে অনুযায়ী ফল পাওয়া যাবে। আমরা এখানে আমাদের পছন্দমতো বীজ বপন করতেপারি। কিন্তু আমাদের উচিৎ তাক্ওয়ার বীজ বপন করা। যেন এর ফলেখেলাফতের স্বর্গীয় আলোয় আমাদের হৃদয় আলোকিত হতে পারে। এটিই প্রশান্তিলাভের প্রকৃত পন্থা।আহমদী খলীফাগণের লক্ষ্য শুধু এটাই ছিল যে, খোদার সৃষ্টিশান্তি লাভ করুক এবং তাদের কষ্টের প্রতিকার হোক। তাদের ওপর চাপানোযুদ্ধসমূহের সমাপ্তি হোক এবং তারা শান্তি করুক।

যুগ ইমামের বাণী

যার মধ্যে ইসলামের সম্মানের জন্য আত্মাভিমান নেই, খোদা তা'লা তার সম্মান ও আত্মাভিমানের পরোয়া করেন না।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১১১)

দোয়াপ্রার্থী: Late Sawkat Ahmad Molla & Jahanara Bibi
From-Sabina Parveen. Banshra, 24 PGS (s)

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর জার্মান সফর (২০১৪)

৫ই ডিসেম্বর, ২০১৩ জার্মানীর হামবার্গ শহরে প্রদত্ত ভাষণ

তাউস এবং তাসমিয়া পাঠের পর হুযুর আনোয়ার (আই.) ভাষণের সূচনা করার পর বলেন:

সকল সম্মানীয় অতিথিদের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি ও কল্যাণ বর্ষিত হোক। আপনাদের প্রতি খোদার কৃপা বর্ষিত হোক।

সর্বপ্রথম আমি উপস্থিত শ্রোতাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই যারা আমাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। আপনাদের মধ্যে অধিকাংই আমাদের জামাতের সঙ্গে ভালভাবে পরিচিত অথবা আহমদী বন্ধুদের সঙ্গে দীর্ঘদিনের আপনাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। আর আমার বিশ্বাস, যে সমস্ত ব্যক্তি অতি সম্প্রতি জামাতের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন, তারাও জামাত সম্পর্কে আরও জানতে আগ্রহী । এখানে আপনাদের উপস্থিতি প্রমাণ করে যে আপনারা জানেন যে, আহমদী মুসলমানদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন কিম্বা তাদের মসজিদে যাতায়াত করার মধ্যে কোন বিপদ নেই।বস্তুত বর্তমান যুগের পরিস্থিতির নিরিখে আপনারা যখন ইসলাম সম্পর্কে অধিকাংশ সংবাদ ও প্রতিবেদনে অত্যন্ত নেতিবাচক কথা শুনতে পান, তখন আপনাদের মধ্যে যারা অমুসলিম আছেন, তাদের মনে মসজিদে এসে নিজেদের জন্য বিপদ ডেকে আনার, এমনকি নিজেদের ক্ষতির আশাঙ্কা হওয়া খুবই স্বাভাবিক বিষয়। তথাপি আপনাদের এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা প্রমাণ করছে যে, আপনারা আহমদী মুসলমানদের সম্পর্কে ভীত নন আর আপনারা তাদেরকে বিপদ হিসেবে দেখেন না।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনাদের এখানে আসা এটাও প্রমাণ করে যে, আপনাদের হৃদয়ে আহমদীদের জন্য এক বিশেষ মর্যাদা রয়েছে আর তাদেরকে অধিকাংশ মানুষের মতই নিষ্ঠাবান ও সভ্যসমাজের অংশ হিসেবে বিবেচনা করেন।

কিন্তু সেই সাথে এমন সম্ভাবনাকেও নস্যাৎ করে দেওয়া যায় না যে, আপনাদের মধ্যে এমন ব্যক্তিরাও আছেন, যদিও তারা আজকের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছে, যারা নিজেদের হৃদয়ে সংশয় পোষন করেন এবং মনে করেন যে, এই অনুষ্ঠানের নেতিবাচক প্রভাবও হতে পারে। এটাও সম্ভব যে, আপনারা এ নিয়ে উদ্বিগ্ন যে, আপনাদেরকে উগ্রতা প্রিয় ও চরমপন্থী চিন্তাধারার মানুষদের মাঝে বসতে হবে। আপনাদের মধ্যে যদি কেউ এমন চিন্তাধারা লালন করেন, তবে তাঁর উচিত হবে তৎক্ষণাৎ সেই চিন্তা মন থেকে মুছে ফেলা। আমরা এ বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন আর যদি কোন উগ্রবাদী ব্যক্তি এই মসজিদে বা আমাদের চতুসীমার মধ্যে প্রবেশ করার চেষ্টা করে তবে তাকে এখান থেকে তৎক্ষণাৎ বের করার জন্য কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করব। আপনারা এখানে নিরাপদ আশ্রয়ে আছেন, এ বিষয়ে নিশ্চিত হোন।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত এমন একটি জামাত যে যদি পৃথিবীর কোন স্থানে কখনও এই জামাতের সদস্য চরমপন্থার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়, আইন অমান্য করে এবং সমাজের শান্তি বিঘ্নিত করে তবে তাকে জামাত থেকে বহিষ্কার করা হয়। 'ইসলাম' শব্দটির কারণে আমরা এই কঠোর পদক্ষেপ নিতে বাধ্য। কেননা ইসলামের আভিধানিক অর্থই হল ভালবাসা ও নিরাপত্তা প্রদান।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমাদের জামাত ইসলামের শিক্ষার প্রকৃত চেতনাকে তুলে ধরে। ইষলামের যে প্রকৃত চিত্রের আমরা ব্যবহারিক নমুনা তুলে ধরি, সে সম্পর্কে আজ থেকে ১৪০০ বছর পূর্বে ইসলামের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (সা.) একটি মহান ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। ভবিষ্যদ্বাণীতে রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, এমন এক সময় আসবে যখন মুসলমানদের অধিকাংশই ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ভুলে বসবে। ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে এমন সময় আল্লাহ্ তা'লা ইষলামের প্রকৃত চিত্র পৃথিবীর সামনে তুলে ধরতে এক ব্যক্তিকে সংস্কারক হিসেবে প্রেরণ করবেন যিনি হবেন মসীহ ও মাহদী। আমরা আহমদীয়া মুসলিম জামাত বিশ্বাস করি যে, আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী-ই সেই ব্যক্তি যিনি সেই ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে প্রেরিত হয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এই জামাত পৃথিবীর ২০২টি দেশে প্রসার লাভ করেছে। সেই সমস্ত দেশে প্রত্যেক শ্রেণীর বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের মানুষ এই জামাতে যোগ দিয়েছে। আর জামাতে যোগ দেওয়ার পর তারা নিজের নিজের দেশে একজন বিশ্বস্ত নাগরিকের দায়িত্ব পালন করছে। জামাতের সেই সকল সদস্যদের ইসলামের প্রতি ভালবাসা আর দেশের প্রতি ভালবাসা পরস্পর সাংঘর্ষিক নয়। বরং উভয় ভালবাসা পরস্পরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আহমদী মুসলমানরা যেখানেই থাকে, তারা সেদেশের সব থেকে বেশি বিশ্বস্ত নাগরিক হয়ে থাকে। সন্দেহাতীতভাবে আমি একথা বলতে পারি যে, আমাদের জামাতের অধিকাংশ সদস্যদের মধ্যেই এই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই আহমদী মুসলমানেরা যখন এক দেশ থেকে অন্য দেশে দেশান্তরিত হন, তখন তারা সেদেশের সমাজের অংশে পরিণত হন এবং একথা ভেবে বিচলিত হন না যে,

যে দেশে তারা বসবাস স্থাপন করেছে সেদেশের বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে তাদের ভূমিকা কি হতে যাচ্ছে। আহমদীরা যেখানেই যায় তারা নিজেদের দেশকে ভালবাসবে- যেমনটি প্রত্যেক প্রকৃত নাগরিকের কর্তব্য। তারা নিজেদের দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথে নিজেদের জীবন নিয়োজিত করবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: ইসলামই আমাদের জীবনযাপনের পথ বলে দেয়। আর এটা কেবল অগভীর কোন আদেশ নয়, বরং নিজের বসবাসের দেশের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বস্ত ও উৎসর্গীত থাকার আদেশ রয়েছে। আঁ হযরত (সা.) অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় এবিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন যে, দেশের প্রতি ভালবাসা প্রত্যেক সত্যিকারের মুসলমানের ঈমানের অঙ্গ। যেখানে দেশের প্রতি ভালবাসা ইসলামের মৌলিক নীতির অন্তর্ভুক্ত, সেখানে কিভাবে একজন সত্যিকার মুসলমান তার দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে এবং নিজের ঈমানকে উপেক্ষা করতে পারে? যতদূর আহমদীদের সম্পর্ক, সমস্ত বড় বড় সমাবেশে জামাতের আবাল বৃদ্ধ বনিতা উঠে দাঁড়িয়ে খোদাকে সাক্ষী মেনে অঙ্গীকার করে। এই অঙ্গীকার বাক্যে তারা নিজেদের প্রাণ, সম্পদ, সময় ও সম্মান বিসর্জন দেওয়ার সংকল্প করে- কেবল ধর্মের জন্য নয় বরং দেশের জন্যও। অতএব সেই সব মানুষদের থেকে দেশের প্রতি অধিক বিশ্বস্ত থাকার দাবি আর কারা করতে পারে? তাদেরকে অনবরত দেশের সেবার কথা স্মরণ করানো হয় আর বারবার এই অঙ্গীকার নেওয়া হয় যে, তারা নিজেদের ঈমান ও দেশের জন্য সব কিছু ত্যাগ করার জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এখানে মানুষের মনে একটি প্রশ্ন জাগতে পারে যে, জার্মানীতে মুসলমানদের অধিকাংশই পাকিস্তান, তুর্কি এবং এশিয়ার অন্যান্য দেশ থেকে এসেছে। তাই যখন নিজেদের দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকারের সময় আসবে তখন তারা জার্মানীর তুলনায় নিজেদের পৈতৃক দেশকে বেশি প্রাধান্য দিবে।

তাই আমি এখানে বিষয়টি স্পষ্ট করে দিতে চাই যে, যখন কোন ব্যক্তি জার্মানীর নাগরিকত্ব লাভ করে বা অন্য কোন দেশের নাগরিকত্ব লাভ করে, তখন সে সেই দেশের পূর্ণাঙ্গ নাগরিকে পরিণত হয়। আমি এবছর জার্মানির বেলিজ শহরে সেনাদের সদর দপ্তরে এই বিষয়টিই তুলে ধরেছিলাম। আমি ইসলামী শিক্ষামালার মাধ্যমে বুঝিয়েছিলাম যে, এমন পরিস্থিতি যখন জার্মানী এমন কোন দেশের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে, যার নাগরিকরা জার্মানীর বাসিন্দা, তখন সেই সব লোকদের কি করণীয়?যদি মুহাজিরদের মনে নিজেদের (পূর্বের) দেশের প্রতি দূর্বলতা প্রকাশ পাওয়ার আশঙ্কা থাকে আর তাদের মনে হয় যে তারা জার্মানীর ক্ষতি করতে পারে বলে বাসনা তৈরী হতে পারে, তবে তৎক্ষণাৎ তার উচিত হবে জার্মানীর নাগরিকত্ব বা অভিবাসন স্টেটাস ত্যাগ করে নিজের পৈতৃক দেশে ফিরে যাওয়া। কিন্তু যদি সে এখানেই থাকতে চায় তবে ইসলাম তাকে সেই দেশের প্রতি কোন প্রকার বিশ্বাসঘাতকতা করার অনুমতি দেয় না যে দেশে সে বসবাস করে। এটি অত্যন্ত স্পষ্ট ও সংশয়মুক্ত শিক্ষা।ইসলাম কখনও কোন প্রকার বিদ্রোহাত্মক কর্মকাণ্ড কিম্বা কোন নাগরিককে তার স্বদেশের বিরুদ্ধে কোন প্রকার ষড়যন্ত্র বা সেদেশের কোন ক্ষতি সাধন করার অনুমতি দেয় না। যদি কোন ব্যক্তি তার হিজরত করে আসা দেশের বিরুদ্ধে কোন কাজ করে বা সেদেশের ক্ষতি করে তবে তার প্রতি একজন বিশ্বাসঘাতক বা দেশদ্রোহীর ন্যায় আচরণ করা উচিত এবং সেদেশের আইন অনুসারে তার শাস্তি পাওয়া উচিত। এই শিক্ষা একজন মুসলিম মুহাজিরের প্রকৃত অবস্থাকে তুলে ধরে। আর একটি পরিস্থিতি হল এই যে, যেখানে একজন জার্মান নাগরিক বা অন্য কোন দেশের বাসিন্দা যারা ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাদের জন্য অত্যন্ত স্পষ্ট নির্দেশনা হল তারা নিজেদের দেশের প্রতি পূর্ণ বিশ্বস্ততা বজায় রাখবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আরও একটি প্রশ্ন প্রায় উঠে আসে আর সেটা এই যে, যখন কোন পশ্চিমি দেশ কোন মুসলমান দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তখন সেদেশের মুসলমানদের কিরূপ প্রতিক্রিয়া হওয়া বাঞ্ছনীয়?

এর উত্তরে আমি সর্বপ্রথম বলব যে, আমাদের জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আমাদের বুঝিয়েছেন যে, আমরা এখন সেই যুগে বাস করছি যখন কিনা ধর্মীয় যুদ্ধের পূর্ণ অবসান ঘটেছে।

ইতিহাসে এমন বহু ঘটনা দেখতে পাই যেখানে মুসলমনরা অন্য ধর্মের মানুষদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। সেই সব যুদ্ধে অ-মুসলিমদের উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম ও মুসলমানদেরকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলা। অতীতের অধিকাংশ যুদ্ধে অমুসলিমদের পক্ষ থেকেই যুদ্ধের সূচনা হয়েছে। আর মুসলমানদের কাছে তখন নিজেদের ধর্মের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সেই আক্রমণ প্রতিহত করার ছাড়া কোন উপায় ছিল না। কিন্তু হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আমাদেরকে বুঝিয়েছেন যে, বর্তমান যুগে সেই পরিস্থিতি আর নেই। কেননা এখন কোন দেশ এমন নেই যারা ইসলামের অস্তিত্ব মিটিয়ে ফেলার জন্য যুদ্ধের ঘোষণা করছে কিম্বা যুদ্ধ করছে। এর বিপরীতে বর্তমানে অমুসলিম পশ্চিমা দেশগুলিতে অনেক বেশি ধর্মীয় স্বাধীনতা রয়েছে। আমাদের জামাত এজন্য কৃতজ্ঞ যে, জামাত এখনে পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা উপভোগ করছে, যেখানে আহমদী মুসলমানরা অমুসলিম দেশে ইসলামের তবলীগ করতে পারে। তাই এখানে ইসলামের সেই সত্য ও সুন্দর শিক্ষা প্রচার করা আমাদের জন্য সম্ভব, যা পশ্চিমা দেশগুলির জন্য শান্তি ও সৌহার্দ্যের বার্তা বহন করে। নিঃসন্দেহে ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সহিষ্ণুতার কারণেই আমি আজ আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা তুলে ধরতে পারছি। অতএব আজকের দিনে ধর্মীয় যুদ্ধের কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

আর অন্য যে কারণ তৈরী হতে পারে সেটা এই যে, একটি মুসলিম প্রধান দেশে এবং একটি খ্রীষ্টান প্রধান দেশ যখন পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তখন কিভাবে সেখানে বসবাসরত মুসলমান নাগরিকরা সেই খৃষ্টান দেশে বা অন্য কোনও দেশের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবে?

এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য ইসলাম একটি সোনালী নীতি উপস্থাপন করেছে। যেটা হল যে, এক ব্যক্তিকে কখনও কোন প্রকার নির্মম বা অন্যায় কাজে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। তাই যদি একজন মুসলমান দেশের পক্ষ থেকে নিষ্ঠুরতা এবং উৎপীড়ন করা হয়ে থাকে তবে তা প্রতিহত করা উচিত। অনুরূপভাবে যদি কোন খৃষ্টান দেশের পক্ষ থেকে নিষ্ঠুরতা ও উৎপীড়ন করা হয়ে থাকে তবে তাকেও প্রতিহত করা উচিত।

একজন ব্যক্তি কিভাবে নিজের দেশকে নিষ্ঠুরতার পথ ও অন্যায় আচরণ করা থেকে বিরত রাখতে পারে? এর উত্তর অত্যন্ত সরল। বর্তমান যুগে পশ্চিমি দেশগুলিতে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা জনপ্রিয়। যদি কোন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি দেখে যে, তার সরকার অন্যায়ভাবে কারো উপর উৎপীড়ন করছে, তবে তাকে এর বিরুদ্ধে সরব হওয়া উচিত এবং দেশকে সঠিক পথের দিশা দেখানোর চেষ্টা করা উচিত। মানুষ দলবদ্ধ হয়েও এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে পারে। যদি একজন নাগরিক দেখে যে, তা দেশ অন্য কোন দেশের সার্বভৌমত্বে হস্তক্ষেপ করছে তবে তার উচিত নিজের দেশের সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং নিজেদের উদ্বেগের কথা জানানো। উঠে দাঁড়িয়ে শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিজের উদ্বেগ ও সমস্যার কথা সরকারকে জানানো কোন বিদ্রোহ বা অরাজকতা নয়। বরং এটাই হল দেশের প্রতি প্রকৃত ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ। একজন ন্যায়পরায়ণ নাগরিক কখনই চাইবে না তার নিজের দেশের সম্মান ক্ষুন্ন হোক বা আন্তর্জাতিক স্তরে দেশের গরিমা ভূলুণ্ঠিত হোক। অতএব এভাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সরব হয়ে নিজের দেশকে ন্যায় ও সত্যের দিকে আহ্বান করে দেশের প্রতি ভালবাসা ও বিশ্বস্ততার বহিঃপ্রকাশ করা যায়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যতদূর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং তাদের সংগঠনের সম্পর্ক, এ বিষয়ে ইসলামের শিক্ষা হল, যখন একটি দেশের উপর অন্যায়ভাবে আক্রমণ করা হয় তখন অন্যান্য দেশগুলির উচিত সেই হামলার নিন্দা করা এবং অন্যায়কারীদের প্রতিহত করার চেষ্টা করা। যদি অন্যায়কারী দেশ সজ্ঞানে আক্রমণ করা থেকে পিছু হটে এবং নিজেকে গুটিয়ে নেয় তবে প্রতিশোধ নেওয়া বা পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে সেদেশের উপর কঠোর শাস্তি ও পক্ষপাতদুষ্ট সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়।

ইসলামের শিক্ষার বৈশিষ্ট হল তোমরা অবশ্যই শান্তির প্রসার ঘটাও। আঁ হযরত (সা.) একজন মুসলমানের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, (একজন মুসলমানের) হাত ও জিহ্বা থেকে অন্যান্য শান্তিপ্রিয় মানুষেরা নিরাপদ থাকে। যেমনটি আমি ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি, ইসলামের শিক্ষা হল, তোমাদের কখনই কোন নিষ্ঠুর ও অন্যায়পূর্ণ কাজে অংশগ্রহণ করা উচিত নয়। এটিই সেই অনিন্দ্য সুন্দর ও প্রজ্ঞাপূর্ণ শিক্ষা যা একজন প্রকৃত মুসলমানের সম্মানজনক মর্যাদার প্রতি নির্দেশ করে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, সমস্ত পুণ্যবাণ ও সম্মানিত ব্যক্তিদের আকাঙ্খা করেন, এমন শান্তিপূর্ণ ও পুণ্যচিন্তা লালনকারী ব্যক্তিরা যেন তাদের সমাজে বাস করে।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) মুসলমানদেরকে এক অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা উপহার দিয়েছেন, যে শিক্ষানুসারে তাদেরকে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করা উচিত। তিনি (সা.) শিক্ষা দিয়েছেন যে, একজন প্রকৃত মোমেনের উচিত সব সময় এমন বিষয়ের সন্ধান করা যা হবে পাক ও পবিত্র। আঁ হযরত (সা.) শিক্ষা দিয়েছেন যে, একজন প্রকৃত মোমেন যেখানেই প্রজ্ঞাপূর্ণ কিম্বা শ্রেষ্ঠত্বের কোন বিষয় দেখতে পায় সেটিকে যেন নিজের হারানো উত্তরাধিকার হিসেবে দেখে। সুতরাং সেই আবেগের সাথে, যেখানে কোন ব্যক্তি নিজের উত্তরাধিকার পেতে চায়, মুসলমানদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে , যেখানেই এবং যার কাছেই প্রজ্ঞাপূর্ণ পরামর্শ বা পুণ্যের কোন বিষয় পেলে তা অর্জনের চেষ্ট করা উচিত এবং তার উপর আমল করা উচিত।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এই যুগে যেখানে মানুষ এত শত উদ্বেগ ও জটিলতার মধ্যে আবদ্ধ রয়েছে, হিজরতকারীদের সমাজে একীভূত হওয়ার বিষয়ে কি অসাধারণ ও পরিপূর্ণ নীতি মুসলমানদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ সমাজে গঠনমূলক ভূমিকা পালনের জন্য এবং স্থানীয় সমাজে সমন্বিত হওয়অর জন্য তাদেরকে প্রত্যেক সমাজ, প্রদেশ, শহর এবং দেশের ভাল ও ইতিবাচক দিকগুলি গ্রহণ করে নেওয়া উচিত। আর এটাও বলা হয়েছে যে, এই ধরণের নৈতিকতা ও উন্নত আচরণ শিখে নেওয়াই যথেষ্ট নয়, বরং মুসলমানদের উচিত সেগুলিকে নিজেদের জীবনের অংশে পরিণত করার চেষ্টা করা। এটিই সেই দিক-নির্দেশনা যা প্রকৃতপক্ষে পারস্পরিক ঐক্য, আস্থা এবং ভালবাসার চেতনা তৈরী করে। নিঃসন্দেহে একজন প্রকৃত মোমেনের চায়তে কে বেশি শান্তিপ্রিয় হতে পারে যে কিনা নিজের ঈমানের শর্ত পূর্ণ করার পাশাপাশি যে কোন ভিন্ন সমাজের সকল ইতিবাচক বিষয়গুলিকে নিজের মধ্যে একত্রিত করার চেষ্টা করে? কে আছে যে এর থেকে বেশি শান্তি ও নিরাপত্তার প্রসার ঘটায়?

বর্তমানের যোগাযোগ মাধ্যমের কারণে পৃথিবী এক বিশ্ব-পল্লীতে পরিণত হয়েছে। এটি সেই বিষয় যে সম্পর্কে আঁ হযরত (সা.) ১৪০০ বছর পূর্বেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এমন এক সময় আসবে যখন পৃথিবী এক হয়ে যাবে আর দূরত্ব সঙ্কুচিত হতে দেখা যাবে। তিনি বলেন, দ্রুতগামী এবং আধুনিক যোগাযোগের মাধ্যমে মানুষ সারা বিশ্বকে দেখতে পাবে। বস্তুত কুরআন করীমের একটি ভবিষ্যদ্বাণী আছে যা তিনি স্পষ্টভাবে বুঝিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে আঁ হযরত (সা.) শিক্ষা দেন, যখন সেই সময় উপস্থিত হবে, তখন মানুষের উচিত হবে একে অপরের ভাল জিনিসগুলি সন্ধান করে সেগুলি অবলম্বন করা, যেভাবে মানুষ নিজের হারিয়ে যাওয়া বস্তু সন্ধান করে। ভিন্নবাক্যে বলা যেতে পারে, সকল ইতিবাচক বিষয় অবলম্বন করা উচিত। কিম্বা বলা যেতে পারে, সমস্ত ভাল গুণ মানুষের অবলম্বন করা উচিত। কুরান করীম এই শিক্ষাকে এভাবে বর্ণনা করেছে যে, সত্যিকার মুসলমান সেই ব্যক্তি যে পুণ্য অবলম্বন করে এবং অসৎ কর্ম থেকে নিজেকে ও অপরকে বিরত রাখে। এই সমস্ত বিষয় মাথায় রেখে এমন কোন দেশ ও সমাজ রয়েছে যে বলবে এমন শান্তিপ্রিয় মুসলমান বা ইসলামকে নিজেদের দেশ ও সমাজে স্থান দিতে চাইবে না বা তাদেরকে সহ্য করবে না? গত বছর আমি বার্লিনের মেয়রের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পেয়েছিলাম। আমি তাঁকে বলেছিলেন, ইসলাম তো শিক্ষা দেয় তোমরা যে কোন সমাজের ভাল ও সুন্দর দিকগুলিকে নিজেদের হারানো উত্তরাধিকার হিসেবে মনে করবে। একথা শুনে মেয়র সাহেব বললেন, আপনারা যদি এই শিক্ষা মেনে চলেন, তবে নিঃসন্দেহে সারা বিশ্ব আপনাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াবে এবং আপনাদের সঙ্গ দিবে।

কিন্তু আমি একথা জেনে আশ্চর্যও এবং দুঃখিত হই যে, জার্মানীতে এমন ব্যক্তিরাও আছে যারা বলে, ইসলাম এবং মুসলমানদের মধ্যে জার্মান সমাজের অংশ হওয়ার যোগ্যতাই নেই। অবশ্য একথা সঠিক যে, উগ্রবাদী ও চরমপন্থীরা ইসলামের যে রূপ তুলে ধরেছে, তাতে সত্যিকার অর্থেই তাদের মধ্যে জার্মান বা অন্য কোন সমাজের অংশ হওয়ার যোগ্যতা নেই। নিঃসন্দেহে এমন এক যুগ আসবে যখন মুসলমান দেশগুলিও উগ্রবাদ ও চরমপন্থার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে শুরু করবে, তথাপি নবী করীম (সা.) যে ইসলাম পৃথিবীতে নিয়ে এসেছিলেন তা সর্বদাই পুণ্যবান ব্যক্তিদেরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে থাকবে। এই যুগে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে পুনরায় পৃথিবীর বুকে উন্মোচিত করতে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)কে নবী করীম (সা.)-এর জিল্ল বা প্রতিচ্ছায়া হিসেবে আবির্ভূত করেছেন। তাঁর জামাত ইসলামের সেই সত্যিকার শিক্ষা অনুশীলন করে এবং সেই শিক্ষারই প্রচার করে। এখন এই বিষয়টি স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, কোন ব্যক্তি একথা বলতে পারবে না যে, প্রকৃত ইসলাম

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-10 Thursday, 12-19 June 2025 Issue No.24-25

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

সমাজের গঠনমূলক অংশ হতে পারবে না। প্রকৃত ইসলাম হল সেই ইসলাম সমাজে পুণ্য ও সততাকে প্রাধান্য দেয় এবং অসৎ কর্ম থেকে বিরত থাকার শিক্ষা দেয়। প্রকৃত ইসলাম মুসলমানদের শিক্ষা দেয়, যেখানে অসৎ কর্ম এবং অন্যায় সংঘটিত হয়, সেই স্থান এড়িয়ে চল।

ইসলামের উপর আপত্তি করা হয় যে, এটা সমাজের গঠনমূলক অংশ হতে পারে না। অথচ ইসলাম চৌম্বকের ন্যায় নিজেই সমাজকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে। ইসলাম শিক্ষা দেয়, এক ব্যক্তির কেবল নিজের জন্যই শান্তি অর্জনের বাসনা এবং চেষ্টা করা উচিত নয়, বরং সমগ্র বিশ্বেই যেন শান্তি ও সৌহার্দ্যের প্রসার ঘটে সেই চেষ্টা করা উচিত। এমন নিঃস্বার্থ চিন্তাধারা বিশ্বকে শান্তির পথ দেখাতে পারে। এমন কোন সমাজ আছে কি যা এই শিক্ষার প্রশংসা করবে না এবং এই দৃষ্টিভঙ্গিকে স্বীকার করবে না? নিঃসন্দেহে একটা ভাল সমাজ চাইবে না সেখানে দুর্বৃত্তি এবং মন্দের প্রসার হোক এবং পুণ্যের প্রসারে বাধা সৃষ্টি হোক। কিন্তু আমরা যখন পুণ্যের পরিভাষা লিখি, সেই পরিভাষায় খুব সম্ভব একজন ধার্মিক ব্যক্তি ও একজন অধার্মিক ব্যক্তির মধ্যে মতানৈক্য থাকতে পারে। ইসলাম যে সকল পুণ্য ও সৎকর্মের শিক্ষা দেয় সেগুলির মধ্যে দুটি পুণ্য সকল পুণ্যের উৎস। সকল পুণ্য এখান থেকেই উৎসারিত হয়। একটি হল 'হুকুকুল্লাহ্' এবং অপরটি হল 'হুকুকুল ইবাদ'। প্রথম পুণ্যটির ক্ষেত্রে ধার্মিক ও অধার্মিক ব্যক্তি মধ্যে মতানৈক্য হতে পারে। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের পুণ্যের ক্ষেত্রে কোন মতানৈক্য নেই। 'হুকুকুল্লাহ্'-র সম্পর্ক আল্লাহর ইবাদতের সঙ্গে আর সমস্ত ধর্মের অনুসারীদেরকেই এর শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।আর হুকুকুল ইবাদ' -এর ক্ষেত্রে ধর্ম এবং সমাজ উভয়েই এই শিক্ষার উপর জোর দেয়। ইসলাম আমাদেরকে অনেক গভীরে গিয়ে অনেক বিস্তারিতভাবে হুকুকুল ইবাদ-এর শিক্ষা দেয়। সমগ্র শিক্ষা আয়ত্ব করা এই সংক্ষিপ্ত সময়ে সম্ভব নয়। তথাপি আমি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকারের কথা উল্লেখ করব যা ইসলাম মানুষের প্রতি মানুষের অধিকার সম্পর্কে বর্ণনা করেছে এবং সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যেগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ইসলাম আমাদের শিক্ষা দেয় যে, আমরা যেন অপরের ভাবাবেগের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হই। এই ভাবাবেগ ধর্মীয়ও হতে পারে এবং সমাজের অন্যান্য সাধারণ বিষয়েও হতে পারে। একবার এক ইহুদী ব্যক্তি এবং এক মুসলমান ব্যক্তির মধ্যে কোন একটি বিষয় নিয়ে বিতন্ডা তৈরী হয় যা রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট মীমাংসার জন্য আসে। তখন আঁ হযরত (সা.) ধর্মীয় ভাবাবেগের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে সেই ইহুদীর পক্ষে রায় প্রদান করেন। সেই ইহুদী ব্যক্তির ভাবাবেগের প্রতি যত্নবান থেকে সেই মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমরা আমাকে মূসার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিও না। যদিও তিনি জানতেন যে, তিনি শেষ শরীয়ত আনয়নকারী নবী এবং শ্রেষ্ঠ নবী। অতএব, এটাই সেই পদ্ধতি যার দ্বারা আঁ হযরত (সা.) অপরের ভাবাবেগের প্রতি সম্মান জানিয়েছেন এবং সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

(৬ পাতার শেষাংশ)

পরিবারে, পিতা-মাতা এবং দুই বোন রেখে গেছেন।

ভালীর জামা'তের প্রেসিডেন্ট সাহেব বলেন, শহীদ মরহুম, উন্নত গুণাবলির অধিকারী ছিলেন, ভালো স্বভাব-চরিত্রের মানুষ ছিলেন। তাকে আমি, উন্নত চরিত্রের, স্বল্পভাষী, খেলাফতের প্রতি অনুরক্ত এবং আনুগত্যকারী খাদেমরূপে পেয়েছি। চাঁদা ও নামাযে নিয়মিত ছিলেন। ওয়াকারে আমল, জনসেবা, নিরাপত্তার ডিউটি অর্থাৎ প্রতিটি বিভাগে আদর্শ কর্মী ছিলেন। জামা'তের কাজে অগ্রগামী থাকতেন। পিতা-মাতার সেবক ও তাদের সবকিছুর প্রতি দৃষ্টি রাখতেন।

মুয়াল্লেম তারেক আহমদ সাহেব বলেন, শহীদ মরহুম অনেক গুণাবলির অধিকারী ছিলেন। তার বাসায় টেলিভিশন ছিল না, কিন্তু নিজের মোবাইলে নিয়মিতভাবে আমার খুতবা শুনতেন। আবার কখনো আমার বাসায় অর্থাৎ মিশন হাউসে খুতবা শোনার জন্য আমার কাছে চলে আসতেন। তিনি বলেন, জামা'তের যে-কোনো কাজের জন্য ডাকলে তাৎক্ষণিক উপস্থিত হতেন। প্রতিটি কাজ গুরত্ব -সহকারে করতেন। জামা'তের মেহমানদের আগ্রহের সাথে সেবা করতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে মাগফেরাত ও ক্ষমার আচরণ করুন। তাকে মর্যাদায় উন্নীত করুন। শোক-সন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্য ও সাহস দান করুন।

পাকিস্তানে সন্ত্রাসীদের ও জামা'তের বিরোধীদের সাহস দিন দিন বেড়েই চলেছে। আল্লাহ্ তা'লা দ্রুতই তাদের পাকড়াও করার উপকরণ সৃষ্টি করুন।

(আল ফজল ইন্টারন্যাশনাল, ২৩ মে, ২০২৫)

আহমদী ছাত্রদের জন্য বিজ্ঞপ্তি

আহমদীয়া ভকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার (দারুল সানাত)-এ ভর্তি চলছে

(শিক্ষাবর্ষ: ২০২৫-২৬)

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর অনুমোদন ও বিশেষ নির্দেশনায় ২০১০ সালে কাদিয়ানে 'দারুল সানাআত' (কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) স্থাপিত হয়। প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য হল আহমদী ছাত্রদেরকে প্রযুক্তি শিক্ষার মাধ্যমে সুদক্ষ করে তাদের জন্য উপার্জনের সুযোগ করে দেওয়া। কাদিয়ানের 'দারুল সানাআত' সরকারি প্রতিষ্ঠান NSIC এবং ISO নথিভুক্ত। এখানে একবছরের বিভিন্ন কোর্স করানো হয়। যেমন-

(1) Computer applications (2) Plumbing (3) Electrician (4) Welding (5) Motor Vehicle (6) Diesel Mechanic (7) AC & Refrigerator

কাদিয়ানের বাইরে থেকে আসা ছাত্রদের জন্য হোস্টেল ও মেসের ব্যবস্থা আছে। থাকা ও খাওয়ার কোন ফি নেওয়া হয় না। কোর্সের জন্য বোর্ড ফি সহজ কিস্তিতে নেওয়া হয় । যে সমস্ত আহমদী ছাত্র স্কুল শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে পারে নি কিম্বা অষ্টম ও দশম শ্রেণীর পর টেকনিক্যাল কোর্স করতে ইচ্ছুক, তারা এই প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন। আহমদী ছেলেদের ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থাও রয়েছে। এছাড়াও প্রত্যহ Personality Development এবং English Speaking-এর ক্লাসও নেওয়া হয়। নতুন শিক্ষাবর্ষ ২০২৫-২৬ এর জন্য ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ২০২৫ সালের ১৬ই জুলাই থেকে ক্লাস আরম্ভ হবে।

বিস্তারিত জানতে নিম্নোক্ত ইমেল ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করুন।

darulsanaat.qadian@gmail.com
Mob:9872725895, 8604024043

(Principal, Darul Sanaat)

১৩০ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০২৫ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৬, ২৭ ও ২৮ শে ডিসেম্বর ২০২৫ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহ্তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সফলতার ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্সানুল জাযা। (নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir